শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা

প্রথম ভাগ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রণেতা

শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত

ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্‌ট্রো মেসিন প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৭ সাল, অগ্রহায়ণ।

 [মূল্য ৸৵০ চৌদ্দ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা

শুনলে রামকৃষ্ণ কথা জীবন জুড়ায় এম্নি মিঠে।
পাষাণে জল ঝরে ভাই, মরা গাছ মঞ্জরে উঠে॥

পাঠক ও প্রবোধ—ইহারা দুই জন রঙ্গালয়ের অভিনেতা। গিরিশ বাবুকে গুরু বলিয়া জানেন। রঙ্গালয়ে যখন চৈতন্যলীলা অভিনয় হয়, তখন হইতে ইঁহারা রঙ্গালয়ে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীপদরজগ্রহণ করিয়াছেন ও মহাপ্রসাদ ধারণ করিয়াছেন।

পা। দেখ্ প্র—সকল রকম নেশা কল্লুম—যখন একটা নূতন নেশা ধরা যায়, তখন দিন ক'য়েক বেশ মজা থাকে, তার পর নেশাটার ধার মুড়ে যায়; কাজেই আবার একটা নূতন নেশা ধর্ত্তে হয়। এই রকম ক'রে সব নেশাই তো ফেল হোলো, বাকি ছিল গাঁজাটি, তাও বুঝি যায় যায়। আয়—আজ গাঁজার শ্রাদ্ধ ক'রে ছাড়বো। এই বেলা ৭টা, চালাও গাঁজা, যতক্ষণ না নেশা হয়। তোর কাছে কত গাঁজা আছে, দেখি।

প্র। চার আনার গাঁজা এই সকালে এনেছি।

পা। আচ্ছা চালাও—টিপো—এই বলিয়া ধূমপান ও কথোপকথন।

কথা হইতে হইতে পরমহংসদেবের কথা পড়িল।

পা। দেখ ভাই—সেই যে পরমহংস ঠাকুর, গিরিশ বাবু যাঁকে 'গুরু 'গুরু' বলেন, তিনি বেশ লোক—আচ্ছা সাধু। সাধুদের যেমন জটা-ফটা থাকে, গেরুয়া কাপড় থাকে, গায়ে ছাই মাখা থাকে, ই'য়ের তা কিছু নাই। আর একটি দেখেছ—সাধুর কিছু অহঙ্কার নাই। ইনি আগেই লোককে নমস্কার করেন। চেহারাটি কেমন! ঠোঁট দুটি ঈষৎ রাঙ্গা রাঙ্গা, চোখ্‌গুলি বাঁকা বাঁকা, মুখখানি ঢল ঢল, আবার উহারই মধ্যে একটি জলুস আছে। দেখ্‌লেই মানুষের মনটি তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কথাগুলি কেমন মিষ্টি! গলার সুর কেমন মিষ্টি! এমন সুন্দর গান ত ভাই কখন শুনি নাই। আমাদের থিয়েটারে কত ভাল গাইয়ে রয়েছে ও আগেও কত ছিল। সকলকারই ত গান শুনেছি, কিন্তু এমন কেউ গাইতে পারে নাই। ঐ মাগীর গলার গরব কত্তো, এখন পরমহংস ঠাকুরের সকলেই সুখ্যাতি করে।

প্র। আর কি একটা পরমহংস ঠাকুরের গুণ আছে—জানিস্—শুনেছি, উনি দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীর পূজারী ছিলেন। কালীর পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে মা সদয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। উনি যখন মনে করেন, ডাক্‌লেই তখুনি মায়ের দেখা পান, মায়ের সঙ্গে কথা হয়। সেই থিয়েটারে একদিন মাগী গুলোকে দে'খে মা আনন্দময়ী মা আনন্দময়ী ব'লে মূর্চ্ছা গেলেন, তার খানিক বাদে বিড় বিড় ক'রে কি বল্‌তে লা গলেন।

পা। ও মূর্চ্ছা নয়, ওকে সমাধি বলে, আর ঐ যে বিড়-বিড়ানি, ঐ মায়ের সঙ্গে কথা। উনি, শুনেছি, সব জান্‌তে

পারেন, মা সব ব'লে দেন। লেখা-পড়া জানেন না, কিন্তু বড় বড় পণ্ডিত হেরে যায়।

প্র। আচ্ছা ভাই, লেখা-পড়া জানেন না, তবে কি ক'রে পণ্ডিতদের হারিয়ে দেন?

পা। মায়ের সঙ্গে যাঁর কথা হয়, সে লোক খানা কি! ওঁকে পণ্ডিতদের সঙ্গে বেশী কথা কইতে হয় না; কি হয় শুন—পণ্ডিতগুলো দূর থেকে লম্ফঝম্প ক'রে আসে, প্রথমে রোক ক'রে খুব তর্ক-বিতর্ক করে; তার পরে, যখন বড় বাড়াবাড়ি হয়, তখন ঐ পরমহংস ঠাকুর ছুঁয়ে দেন—আর পণ্ডিতগুলোর ভেবা-চাকা লেগে যায়।

প্র। তার পর?

পা। তার পর আর কি, সে তর্জ্জন-গর্জ্জন করা দূরে থাক্, কেউ হাত যোড় ক'রে স্তব করে, কেউ পায়ে লুটে, কেউ বলে, আমাকে চৈতন্য দাও—কেউ কাঁদে, এই রকম আর কি।

প্র। আচ্ছা ভাই—একটা কিছু দে'খে ত অমন করে; ছুঁয়ে দিলে কি দেখে, কিছু শুনেছ?

পা। হাঁ শুনেছি—কেউ শিব দেখে, কেউ কালী দেখে, কেউ রাম দেখে, কেউ কৃষ্ণ দেখে আবার কেউ কেউ যে কি দেখে, তা কিছু বোল্‌তে পারে না। কত লোক ঐ লোকটির কাছে কাবু হ'য়ে গেছে। এই দেখ্‌না, আমাদের চোখের উপর, গিরিশ বাবু কি হয়ে গেলেন! গিরিশ বাবু ত একটা সিদা লোক নয়। লোকটা কারও কাছে মাথা নোয়ায় না। মেসো, পিসা, মামা ইত্যাদি গুরুজনকে নমস্কার কত্তে হবে ব'লে আত্মীয় লোকের বাড়ী যায় না। ঘোর নাস্তিক। বাঘে

ধ'রে খেতে আসে, তবু ভগবানের নাম মুখে আনে না। সাধু সন্ন্যাসী দেখ্‌লেই চড়, ঠেঙ্গা উছিয়ে রাখে। দেবদেবীর প্রতিমা কাটারি দিয়ে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কাটে। সব জানিস্ ত—ঐ পরমহংসঠাকুরকে প্রথম প্রথম থিয়েটারে কত গাল দেওয়া হ'লো। তার পরে পরমহংসঠাকুর সেই আপনার মন্তর ছেড়ে দিয়ে ছুঁয়ে দিবা মাত্রই গিরিশ বাবু—কাবু। এখন গিরিশ বাবুই ওঁকে ভগবান্ বলেন।

প্র—আচ্ছা ভাই আর কেহ এমন হয়েছে জানিস্?

পা। হাঁ, সে দিন, শশধর তর্কচূড়ামণি বক্তৃতায় সহরকে তোলপাড় ক'রে দিলে। যে তার বক্তৃতা শুনে, সেই বাহবা দেয়। আজ এখানে বক্তৃতা, কাল সেখানে বক্তৃতা, একটা হুলস্থূল প'ড়ে গেল। তার পর ঐ পরমহংসঠাকুর তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা ক'রে, তাকে ছুঁয়ে দিয়ে কি বল্লে।

প্র। তার পর?

পা। তার পর আর কি—যেমনি ছোঁয়া, অমনি বোবা হওয়া। সেই শশধর কত দিন পরমহংসঠাকুরের পেছু পেছু ঘুরলে, কি দেখ্‌লে, এখন আর সাড়াশব্দ নেই।

প্র। আর কারও কথা জানিস্?

পা। ঢের ঢের, অনেক—সময়ে আবার বল্‌বো।

প্র। তুই এত কোথা হোতে শুন্‌লি?

পা। ওরে ভাই, আজকাল যেখানে যাই, সেইখানেই ঐ পরমহংসঠাকুরের কথা।

প্র। এখন ঐ ঠাকুর কোথায়?

পা। শুনেছি, তিনি এখন কাশীপুরে একটি বাগান-বাড়ীতে

আছেন। তাঁর গলায় বেদনা হ'য়েচে, তাই তাঁর ভক্তেরা সেখানে তাঁকে রেখে চিকিৎসা করাচ্চে। ব্যারাম বড় শক্ত। শুনেছি, সহরের ডাক্তার কবিরাজ সব হার মেনে গেছে। ডাক্তার সরকারও কিছু কত্তে পারেন নি।

প্র। চল্ এখন সেই পরমহংসঠাকুরকে দে'খে আসি। ব্যারাম এমন শক্ত হয়ে'চে, শুনে প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌লো।

পা। আমারও ভাই—তবে চল্— আর গাঁজা আছে?

প্র। আছে, এক টিপ হবে।

(সেই গাঁজা ছিলিমটি খেয়ে তুজনে পথে বেরুলো। এখন বেলা প্রায় দুপুর পেরিয়ে গেছে; খানিক গিয়ে তুজনেরই খিদে পেলে।)

প্র। ভাই, খিদেয় আর চলা যায় না, দেড় কোশের উপর পথ। সঙ্গে তুজনের মধ্যে কারও একটা পয়সা টেঁকে নাই। যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন যাই হোক্ যাব। তুই যে আগে বল্লি, যে পরমহংস ঠাকুর আরও অনেক লোককে ছুঁয়ে দিয়ে বোবা ক'রে দিয়েছেন, তাদের কথা বল্‌বো, কই, এখন বল্ না। দেখ্, ঐ ঠাকুরটি যেমন সুন্দর, তাঁর সম্বন্ধে কথাগুলিও তেমনি।

পা। আমি সেদিন বাবু দত্তর গুলীর আড্ডাতে গিয়েছিলেম, সেখানে অনেকেই ঐ পরমহংসঠাকুরের কথা কচ্ছিল। কথাগুলি বেশ শুন্‌তে লাগ্‌লো। এক জন বোল্লে, কেশব সেন এত চেলা কল্লেন, বিলাতে গিয়া বক্তৃতা দিয়ে বড় বড় সাহেবকে মোহিত কল্লেন, এখানে ভারতবর্ষে কত ব্রাহ্ম-মন্দির স্থাপন কল্লেন, তাঁর বক্তৃতার এমন জোর যে, মানুষ শুন্‌লেই তাঁর বশ

হ'য়ে যায়—সেই বিডন গার্ডনে তোমাদের মনে নাই—যে দিন বক্তৃতা হোলো, অত বড় বাগানটার বাহিরে ভিতরে লোক আর ধরে না, সহর তোলপাড়। তার পর কেশব বাবুর পরমহংসঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়।

প্র। দেখা হয়ে কি হ'ল ?

পা। সে লোকটি বল্লে, পরমহংসঠাকুরের দিন কত সঙ্গ করতেই সেই কেশব বাবুর মোড় ফিরে গেল—সে কেশব বোদলে আর এক কেশব হয়ে গেল। আপনার শিষ্যদিগকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাওয়া আসা করতে লাগ্‌লেন। কখন কখন পরমহংসঠাকুরকে আপনার ঘরে আন্‌তেন। এই রকম হ'তে হ'তে কেশব সেনের সে বক্তৃতার চোট কোন্ দিকে উড়ে গেল, আর মুখটি বুজে পরমহংসঠাকুরের পা-তলাটিতে ব'সে তিনি কি বলেন, সেই সবগুলি শুন্‌তেন। একদিন পরমহংসঠাকুর কেশব বাবুকে বলেছিলেন, কেশব, তুমি কেমন বক্তৃতা কর, কিছু বল না ? তাতে কেশব বাবু জবাব দেন, "মহাশয় ! কামার ঘরে কি ছুঁচ বিক্রী।"

প্র। কি আশ্চর্য্য, একজন কালীর পূজারী বামুন, মোটে লেখা-পড়া জানা নাই—তাঁর কাছে কেশব বাবুর মত এত বড় একটা লোক এমন হয়ে গেল ! এই ত সহরে হাজার হাজার পূজারী বামুন, ভট্টাচার্য্য, টোলের অধ্যাপক রয়েছেন, সংস্কৃত বোল আউড়িয়ে দিক্ আঁধার ক'রে দেন, কই, এমন ত কেউ নয়, আর কোথাও আছে, তাও ত শুনি নাই।

পা। তুই ত নিজেই বল্লি—এই খানিক আগে যে, তোকে কে ব'লেছিল যে, পরমহংসঠাকুর কালীর পূজারী ছিলেন। তাঁর

পূজায় মা খুসী হয়ে তাঁকে দেখা দিয়াছিলেন আর ডাক্‌লেই মা আসেন আর তাঁর সঙ্গে কথা হয়। মা কালীর সঙ্গে যাঁর কথাবার্ত্তা হয়, তাঁর সঙ্গে আবার কি কারও তুলনা আছে? ঈশ্বর জানিত লোক!

(প্র ও পা এই দুইজনের মধ্যে পা বুঝদার লোক, প্র বড় কাঁচা)

প্র। আচ্ছা, পরমহংসঠাকুর মা কালীর পূজা কার্ত্তে কর্ত্তে মা কালীর দেখা পেলেন—আর এই সহরের ভিতরে এত কালীমূর্ত্তি রয়েছে, সব জায়গাতেই পূজারী বামুন রয়েছে—মাঁকে বেশ সাজায়, বেশ ভোগ দেয় তারা এমন না হ'য়ে আর রকম হয় কেন বল দেখি? কালীঘাট ত একটি পীঠস্থান—মা জাগ্রত—সেখানকারও ত খবর জানি।

পা। যে যা চায়, সেই তাই পায়—পরমহংসঠাকুর মায়ের পূজার জন্য পূজারী হয়েছিলেন, মা কালীর দর্শন পাবার আশায় তাঁর পূজারী হয়েছিলেন, মায়ের সঙ্গে কথা কইবার জন্য পূজারী হ'য়েছিলেন, তাই মা কালী তাঁর পূজা নিয়েছেন, তাঁকে দেখা দিয়াছেন, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়েছেন ও ডাক্‌লেই এসে কথা কন। আর এঁরা উপরে ভক্তিযুক্ত হ'লে কি হবে, এরা ত আর পূজারী নন—পূজার অরি। মাও তেমি পূজা নেন, আর মায়ের চরণ লাভ, কি মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তার বদলে—যা চান—চাল কলা, তাই লাভ হয়। আর যাঁরা পূজা দেওয়ান তাঁদের সঙ্গে (দক্ষিণের খাতিরে) কথাবার্ত্তা হয়ে পূজাকাণ্ড শেষ হয়।

প্র। তুই ভাই এত বুঝ্‌লি কি ক'রে এক সঙ্গেই ত এত কাল রয়েছি—কৈ, আমি ত কিছু বুঝ্‌তে পারি নি।

পা। আমিও কিছু বুঝ্‌তেম না—তবে যে দিনে পরমহংস ঠাকুর থিয়েটারে ডান পাটি বাড়িয়ে দিয়ে সমাধিগত হ'লেন, আর গিরিশ বাবু চেঁচিয়ে বল্লেন, "আয় কে কোথায় আছিস্, শীঘ্র পায়ের ধূলা নে," আমি তাড়াতাড়ি এসে পায়ের ধূলা নিলুম আর বল্লুম, (সে সময়ে চোখে এক ফোঁটা জলও এল) ঠাকুর, কৃপা কর। তার পর থেকে আমি কেমন একটু একটু বুঝতে পাচ্চি, আর আমাকে একটা কেমন কেমন ক'রেছে। আমি দেখ্‌ছি, এই ঠাকুরেরই কৃপায় বুঝ্‌তে পাচ্চি। আর একটি মজা, যত এই ঠাকুরের কথা শুনি বা বলি—যা আমি কখন জানতাম না, তাও আমি বুঝ্‌তে পারি।

প্র। ঐ যে বল্লি, আমাকে কেমন কেমন ক'রেছে, ওর মানে কি? তোকে কি করেছে? তোর কি হয়েছে—ভেঙ্গে বল্।

পা। আমি ঐ যা বলেছি, ওর বেশি কিছু আর বোল্‌তে পার্‌বো না। তবে কেমন জান্‌বি—যেমন খুব ঘুমিয়েছিলুম, এখন ঘুমটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা।

প্র। আমি তোর কথা কিছু বুঝ্‌তে পারিনে—হাঁ ভাই, কি ক'রে তোর মতন বুঝ্‌তে পার্‌বো?

পা। চল্; এইত সেই ঠাকুরের কাছে যাচ্চি। আমিও আবার কিছু মাগ্‌বো, তুইও কিছু মাগিস্।

প্র। আমি কি মাগ্‌বো, কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না, তুই ব'লে দে?

পা। যাঁর কাছে যাচ্চিস্, তিনিই বুঝিয়ে দিবেন, মাগিয়ে দিবেন।

(এম্নি রামকৃষ্ণজীর মহিমা—তাঁর কথার এমান মহিমা! প্র ও পা যত ঠাকুরের কথা কচ্চে, ততই তাদের চৈতন্য উদয় হচ্চে ও ঠাকুরের লীলার ভিতর বুদ্ধি প্রবেশ কচ্চে। রামকৃষ্ণ-নামই মহামন্ত্র—রামকৃষ্ণকথা আন্দোলনই সাধন-ভজন। লীলাকথা কীর্ত্তন করতে করতেই জীবের চৈতন্যোদয় হয়। কাঠে কাঠে ঘর্ষণ কর্‌লে যেমন সর্ব্বভুক্ অগ্নির উৎপত্তি হয়, ঠিক সেই প্রকার রামকৃষ্ণকথা আন্দোলন কর্‌তে কর্‌তে তমোনাশী চৈতন্যের উদয় হয়।)

প্র। তুই যে বল্লি, পরমহংসঠাকুরের সঙ্গ পেয়ে কেশব বাবুর মোড় ফিরে গেল, ওটা কি বুঝ্‌তে পার্‌লেম না—ভেঙ্গে বল্ দেখি।

পা। যে লোকটি ঐ কথা বলেছিল, আমিও তোর মত বুঝ্‌তে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তিনি যা বল্লেন, আমিও ভাল বুঝ্‌তে পারি নি। বোল্লেন—কেশব বাবু আগে নিরাকার নিরাকার কত্তেন, এখন মা মা করেন। এর মানে, কেশব বাবু আপনার ইচ্ছামত একটা পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, পরমহংসঠাকুর দেখ্‌লেন—গন্তব্য স্থানে যেতে হ'লে এটা ঠিক পথে যাওয়া হচ্চে না, অম্নি কেশব বাবুকে ঠিক পথে চালিয়ে দিলেন।

প্র। কথাটা আর একটুক্ ভেঙ্গে বল দেখি।

পা। শোন্, একটা উপমা দিয়ে বলি। যেমন একখানা নৌকা, তার মাঝি নাই। আর খুব ঝড় দিয়েছে। নৌকাটা দিক্-বেদিক্ মান্‌ছে না, যে দিকে ঝড়ে নিয়ে যাচ্চে, সেই দিকেই ছুটে যাচ্ছে—তাতে যে চড়ায় লেগেই হোক্ আর শক্ত

জায়গায় লেগেই হোক, ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে ডুবে যাবে তা নিশ্চয়। এমন সময় যদি একজন পাকা মাঝি সেই নৌকায় টপ্ ক'রে ওঠে, তহোলে মাঝিটি কি করে? মাঝিটি অম্নি হাল্‌টি ধ'রে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। কেশব বাবু খুব অনুরাগী লোক, ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ঠাকুর ঠিক পথটি দেখিয়ে দিলেন ও সেই দিকে চালিয়ে দিলেন।

"ঠাকুর রামকৃষ্ণজী গলার বেদনা হেতু প্রায় দশ মাস অন্ন খেতে পারেন নাই। সেবকেরা পানীয়ভাবে তরল দ্রব্য খেতে দিতেন। এখন তাও খেতে পারেন না। যা মুখে দেন তার অধিকাংশই মুখ থেকে পড়ে যায়; যৎকিঞ্চিৎ উদরগত হয়; তাই সেবকেরা খাওয়াবার জন্য খাবার কিছু বেশী ক'রে করেন। আজ বেদনা বাড়াবাড়ি নামমাত্র মুখে দিয়েছেন; সম্মুখে পাত্রে সব প'ড়ে আছে।"

ঠাকুর দ্বিতলে যে ঘরে আছেন তার সকল দরজা জানালা বন্ধ। যেখানে তাঁর শয্যা সেটি অতি নিভৃত স্থান। এখানে মানুষ থাক্‌লে বাগানের মধ্যে নীচে কে আস্‌ছে যাচ্চে কিছুই জানা যায় না। ভক্তবৎসল ঠাকুর কিন্তু জান্‌তে পেরেছেন যে প্র ও পা দর্শন লালসায় এসেছে, আর তাদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে। অম্নি ঠাকুর একজন সেবককে বল্লেন, দেখ্—যে দুটি লোক এই মাত্র নীচে এল তাদিগে শীঘ্র ডেকে নিয়ায়। সেবক আজ্ঞা-মত সেই ভাগ্যবান দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের ঘরের দরজা প্রবেশ কর্‌তে না কর্‌তে, ঠাকুর তাদিগে ঘন ঘন হাত বাড়িয়ে ডেকে বল্লেন, আয় আয় আমি তোদের জন্য খাবার নিয়ে ব'সে রয়েছি। তোদের বড় ক্ষুধা পেয়েছে খা খা। উভয়ে ঠাকুরকে

প্রণাম ক'রে চরণ-রেণু নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মহা-প্রসাদ উদর পূর্ণ ক'রে খেতে লাগ্‌লেন।

"ভক্তিবান ও হৃদয়বান পাঠক, ছবিটি একবার হৃদয়-পটে এঁকে দেখুন। আমার কি সাধ্য যে কাঠের কলমে কালি দিয়ে এই অপূর্ব্ব লীলা-চিত্র আঁক্‌তে পারি। লীলা কি বিচিত্র! নিত্য অপেক্ষা লীলা অতীব সুন্দর। যিনি বাক্যমনের অগো-চর, পুরুষপ্রধান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্বাণুপ্রবিষ্ট, পূর্ণব্রহ্মসনাতন, অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই তাঁর মর্ত্ত-রঙ্গালয়ে আজ কাশীপুরের বাগানে কতিপয় ভক্তসঙ্গে জগতের চক্ষে ধূলা দিয়ে রামকৃষ্ণলীলার শেষাংশটি অভিনয় কর্‌ছেন। অঙ্গের সাজ দীনতা হীনতা—জীব- হিতার্থে অপার করুণা। শরীরটি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার। বাক্যমনের অগোচর হয়েও জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য ঠিক তাদের মতন হয়ে,নিজে কি, তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন দীন দুঃখীর সাজটি মাত্র কিন্তু রাশি রাশি দেবেশ-দুর্ল্লভ রত্নমণি অকাতরে যাকে তাকে বিতরণ কচ্চেন। প্র ও পাকে ল'য়ে তিনি আজ যে খেলাটি কর্‌লেন, তা শুনে কোন্ পাষাণ প্রাণ না গোল্‌বে! দেখুন, দয়ার তুলনা বা পরিমাণ আছে কি? দেখুন দেখি ঠিক সেই পতিত-পাবন বটেন কি না? জগদীশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান জানিয়াও মানুষে যে কোন্ বুদ্ধিতে অবতার বাদের প্রতিবাদ করে, তা এ বুদ্ধিতে বুঝ্‌তে পাল্লুম না—সে বুদ্ধিকে নমস্কার।"

"রামকৃষ্ণজীর আনন্দময় মূর্ত্তি। হাজার বদ্ধজীব হোক না কেন, যতক্ষণ তাঁর কাছে থাকে, ততক্ষণ সে আনন্দসাগরে ভাস্‌তে থাকে, কখন ডুবে থাকে। রামকৃষ্ণজীর এই তাপ-

নিবারণ-মহিমা আমরা বরাবর দেখেছি।" পা ও প্র পরমানন্দে উদর পূর্ণ করে মহাপ্রসাদ খেলেন। পরে ঠাকুরের কাছে বিদায় নেবার সময় চোখ ছল্ ছল্—জোড় হাতে বোল্লেন,—ঠাকুর, আপনার চরণে যেন রতি মতি থাকে। ঠাকুর চুপ কোরে রৈলেন আর একটুকু হাস্লেন। তাঁর একটী ভুবন-মোহন হাসি মুখ ছিল, সেটী দেখ্লে আর তাঁকে কোন জন্মেও ভুল্বার যো নাই, সেই হাসিমুখটি দেখালেন। এঁরা পথে ঠাকুরের কথা কইতে কইতে ঘরে এলেন। তার পর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা শুন্লেন ঠাকুর আর লীলাধামে নাই। শুনে দিন কয়েক হায় হায় কোল্লেন, তারপর থেমে গেলেন।

রামকৃষ্ণজীর কৃপায় এঁদের পূর্ব্বপ্রকৃতি ক্রমে বোদ্লে যেতে লাগ্লো। সংসার ধর্ম্মে আঁট হোলো; স্ত্রী-পুত্রের উপর কর্ত্তব্য কি, বোধ হলো। নেশা ভাং কমে গেল, রামকৃষ্ণজীর কথা শুন্তে পেলে, মন দিয়ে শুনেন; ঠাকুরের ভক্ত দেখলেই ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, ঠাকুরের মহোৎসবে যোগ দেন; রামকৃষ্ণজীর লীলাগুণ গীতছন্দে বাদ্যযন্ত্র সহকারে অনেকে একত্র হয়ে সমস্বরে কীর্ত্তন করেন; রঙ্গালয়ে সাজ ঘরে রামকৃষ্ণজীর ফটো প্রতিমূর্ত্তি রাখেন এবং অভিনয়ের দিনে সুন্দর সুন্দর গোছা গোছা ফুলের মালা দিয়ে সাজান; যতবার সাজ ঘর থেকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কোর্তে আসেন; ততবার ঠাকুরকে প্রণাম করেন; অভিনেতৃ নটীদিগে, ঠাকুরকে ভক্তি কোর্তে বলেন; মধ্যে মধ্যে একসঙ্গে ঠাকুরের গুণের কথা কন। ক্রমে ঠাকুরের উপর ভালবাসা জন্মালো।

এই রকমে বার তের বৎসর কেটে গেল—এখন তাঁরা দেখ্‌লেন, তাঁরা যে ঠাকুরটিকে দেখেছেন, যাঁকে এত ভক্তি করেন, তিনি বড় সিদা ঠাকুর নন্; একটা বড় কেওকেটা নন্, তাঁর মহিমা দেশ বিদেশের লোকদিগকে স্তম্ভিত করে দিলে; ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি বড় বড় জায়গায় রামকৃষ্ণ নামের পতাকা উড়্‌ছে—দলে দলে সাহেব বিবি ঠাকুরের লীলাস্থল দেখ্‌তে আস্‌ছে, ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত তাঁর জীবনী লিখ্‌ছেন, তাঁর বিষয় আন্দোলন কর্‌ছেন, যে সব ঠাকুরের ভক্তদিগে ছেলেমানুষ জান্‌তেন, তাঁরা দিগ্‌বিজয়ী হ'য়ে উঠ্‌ছেন—মানুষে যা কর্‌তে পারেন নাই, সে সব কাজ কোর্‌ছেন। এই সকল দেখে শুনে ঠাকুরের লীলাকথা শুন্‌তে তাঁদের বড় ইচ্ছা হ'ল। একদিন ঠাকুরের শরণাপন্ন একটি ভক্তের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তাঁকে বোল্‌লেন—মশায়, আপনি আমাদিকে ঠাকুরের কিছু কথা শুনাবেন? আমাদের ঠাকুরের কথা শুনার বড় সাধ হয়েছে। সে লোকটি থিয়েটারের লোকদের মধ্যে রামকৃষ্ণ-ভক্তির স্রোত বইতে দেখে, তাদের কাছে কেঁদে ফেল্‌লেন আর বোল্‌লেন, দেখ ভাই, আমি মূর্খ, আর রামকৃষ্ণজীর মহল্লীলা—তা আমি কেমন ক'রে বোল্‌বো, তবে তিনি কৃপা ক'রে যা দেখিয়েছেন, যা শুনিয়েছেন ও জানিয়েছেন, তা বোল্‌বো, তোমরা জিজ্ঞাসা কর।

পা। আপনারা যে রামকৃষ্ণজীকে ভগবান্ বলেন, সত্যি কি তিনি ভগবান্?

ভ। তুমি আগে একটা কথার জবাব দাও, তারপর আমি ব'লবো। তুমি ভগবান্ কাকে বল? তোমার ভগবান কিরূপ?

পা। ভগবান্ মস্ত বড়, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি মনে কল্লে সব করতে পারেন—তিনি এই সৃষ্টি দুনিয়ার মালিক—রাম ভগবান্—কৃষ্ণ ভগবান্। আমি এই বুঝি।

ভ। রামকৃষ্ণজীও তাই।

পা। কৈ আমরা কিছু বুঝতে পারি নাই—আপনি বুঝিয়ে দিতে পারেন? ভগবান্ যে, তার প্রমাণ কি?

ভ। প্রমাণ, রামকৃষ্ণলীলা দর্শন ও তাঁর কৃপা। ভগবান্ যখন অবতার হ'য়ে আসেন, তখন তাঁতে একটী লক্ষণ থাকে—সেটি কি জান—যে দেহে কোন লক্ষণই থাকে না, সেই দেহধারী ভগবানের অবতার। অবতারকে কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। অবতার উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষের বিষয়। তিনি প্রত্যক্ষ হ'লে জানতে পারা যায় যে, তিনি লক্ষণাতীত—এই লক্ষণযুক্ত; আমার ধারণা এই।

পরমহংসদেব, অবতারের একটি লক্ষণ দিতেন, তাহা এই, —যে দেহে প্রেমভক্তির বন্যা ব'য়ে যায়, যিনি রাত্রিদিন ঈশ্বর-প্রেমে বিহ্বল, সেই দেহধারী ঈশ্বরের অবতার। যতদিন ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না পাওয়া যায়, ততদিন এই লক্ষণ কেও বুঝতে পারে না।

আর একটি কথা বলতেন যে অবতার অচেনা গাছের মত। একরকম গাছ আছে তার নাম অচেনাগাছ তার মানে—কেও তাকে চিনতে পারে নাই। আবার তিনি পাহারাওয়ালার হাতের আঁধারে লণ্ঠনের উপমা দিয়ে বলেছেন, যে তাঁকে চেনাও যায় ও দেখাও যায়। পাহারাওয়ালা রাত্রিতে গলি ঘুঁজিতে পাহারা দিবার জন্য হাতে একটা লণ্ঠন রাখে তাকে

আঁধারে লণ্ঠন বলে। এই লণ্ঠনের এমন একটি গুণ আছে যে, যার হাতে থাকে, সে ঐ লণ্ঠনটি দিয়ে সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাকে কেও দেখতে পায় না ; তবে যদি পাহারওয়ালা ঐ লণ্ঠনটি আপনার নিজের দিকে ফিরিয়ে দেয়, তাহোলে তাকে দেখা ও চেনা যায় ; সেই রকম নরদেহধারী সেই চৈতন্যময় যে বলে নিজেকে লুকিয়ে রেখে আগোটা সৃষ্টি জীব-জগৎ দেখছেন, যদি সেই চৈতন্য আলোটী দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে দেন, তাহোলে মানুষ তাঁকে দেখ্‌তে ও চিনতে পারে। এইখানে তোমাদিগকে একটী কথা বলি শুন—অন্যান্য অবতারের মত রামকৃষ্ণজীকে চেনা বড় শক্ত। এঁতে ত রজের ঐশ্বর্য্য নাই, এঁতে আগাগোড়া শুদ্ধসত্ত্বের ঐশ্বর্য্য। দীন ভক্তভাবে সত্ত্বের ঐশ্বর্য্য চেনা, ধরা বড় শক্ত। এখানে তো রাক্ষসবংশ ধ্বংসও নাই, আর কুরুক্ষেত্রের অষ্টাদশ অক্ষোহিণী নিপাতও নাই আর অঘাসুর, বকাসুর, তাড়কা, পুতুনা বধও নাই। এ সব চোখে দেখে, কাণে শুনে লোকে একটা বুঝতে পারে, কিন্তু এখানে সত্ত্বের ঐশ্বর্য্য ; এ চোখে কাণে দেখা শুনা যায় না,—স্বতন্তর চোখ কাণ চাই। এবারে কি হ'লো জান! এবারে ভগবানের ভাণ্ডারের রত্নমণি—যে রত্নমণি অকুল অপার মহাসাগরের জলে লুকানো ছিল, তাই লুঠ হ'য়ে গেল। রামকৃষ্ণজী নিজের দেহ দিয়ে অগণ্য দুঃসাধ্য সাধন মন্থনে সে সব রত্নমণি বের ক'রে মুড়ি মুড়কির মত জগতে বিলিয়ে দিলেন। এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত পরে যথাসাধ্য বলবো। রামকৃষ্ণজী এখন আমাকে যা দেখিয়েছেন, যা বুঝিয়েছেন, তাতে বেশ দেখ্‌তে পেয়েছি ও বুঝতে পেরেছি, যে তিনিই সেই ভগবান, ভগবানের অবতার; দুনি-

য়ার মালিক, সর্ব্বশক্তিমান—সেই রাম—সেই কৃষ্ণ—সেই কালী—সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—মনবুদ্ধির পার ও মনবুদ্ধির গোচর। তোমার আমার পক্ষে তাঁকে জানবার তাঁর লীলাদর্শনই সহজ পায়।

পা। লীলা শ্রবণই করা যায়, দর্শন করা যায় কি রকম?

ভ। তুমি যখন একাগ্রমনে ঐ পথে যাবে, তখন আপনিই বুঝতে পারবে। আভাসে কথাটা কেমন জান, একটী সুন্দরীর রূপবর্ণন শুনতে শুনতে একটী ভাব উদয় হয়, তার পর ঐ ভাব থেকে অন্তরে সুন্দরীর যেমন একটা ছবি উঠে, তেমনি লীলা-কথা শুনতে শুনতে লীলার ভাব ফুটে, পরে ভাব থেকে লীলার ছবি উঠে। এই ছবি দেখতে পেলেই বুঝতে পারবে যে, ঐ লীলাটী যাঁর, তিনি কে।

পা।—রাম-অবতারে, কৃষ্ণ-অবতারে কত শত আশ্চর্য্য ঘটনা আছে, যেমন কাঠ সোণা হ'ল, পাষাণী মানুষ হ'ল, গিরিগোবর্দ্ধন ধরা হ'ল, কৃষ্ণ কালী হলেন, পুতনা মোলো, কংস গেল, গীতা বোল্লেন। এখানে কৈ কি হ'ল?

ভ। এর চেয়ে অনেক বেশী বেশী হয়েছে। আজ পর্য্যন্ত যত অবতার হয়েছেন, তাঁরা সকলে মিলে যা ক'রেছেন, রামকৃষ্ণজী সে সব করে তার উপর আরও কিছু নূতন করেছেন, কিছু বেশী ক'রেছেন। তুমি যে সকল অবতারের কথা বল্লে, তাঁদের লীলাকথা শুনেছ, তাই তাঁদিগে ভগবান ব'লে বিশ্বাস হয়েছে। রামকৃষ্ণলীলা শুন, তা হ'লে রামকৃষ্ণজী কি বুঝ্‌তে পারবে। তোমাদের রামে, কৃষ্ণে যখন বিশ্বাস আছে, তখন রামকৃষ্ণলীলা সহজে বুঝ্‌তে পারবে। যিনি একটী অবতার বুঝেন, তিনি

সব অবতারই বুঝেন। যাঁর একটিতে বিশ্বাস নাই, তাঁর কোনটিতেই নাই।

সাগরে নিধিরত্ন যেমন জলের উপরে থাকে না, জলের ভিতরে থাকে এবং খুব ডুব দিলে সেই সব রত্ন যেমন পাওয়া যায়, তেমনি রামকৃষ্ণলীলা-সাগরে ডুব দাও, নানা নিধি পাবে, আর তাঁকে রত্নাকর ব'লে জান্‌তে পারবে।

পা।—আপনি যে বল্‌লেন, সকল অবতারে যা করেছেন, রামকৃষ্ণজী যে সব ক'রে আবার তার চেয়ে কিছু বেশী করে-ছেন; তা হলে আপনি কি বলেন, রামকৃষ্ণজী অন্যান্য অব-তারের চেয়ে বড়?

ভ।—সকল অবতারেই সেই এক ভগবান। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপমাত্র ও ভিন্ন ভিন্ন লীলামাত্র। যখন যে লীলায় যা কাজ আবশ্যক হয়, তখন এক অবতার হ'য়ে সেই কাজ করেন। তাঁর প্রত্যেক অবতারে, সব কাজ কর্‌বার শক্তি থাকে, তবে সব কাজের আবশ্যক হয় না।

তুমি তোমাদের রঙ্গালয়ের দৃষ্টান্তে বুঝে লও। তোমাদের 'জনা' অভিনয়ে অনেক চরিত্রের অভিনয় আছে, কিন্তু তুমি কেবলমাত্র বিদূষকের চরিত্রটিই অভিনয় কর; কিন্তু যদি রাজার, কি শিবের, কি গঙ্গা-রক্ষকের, কি অর্জ্জুনের চরিত্র অভি-নয় কর্‌তে হয়, তা হোলে কি পার না? পার—তবে আবশ্যক হয় না; তেমনি সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবান্ যে অবতারে যা দরকার, সেই অবতারে তাই করেন। এই রামকৃষ্ণ অবতারে সব আদর্শ অবতারের খেলা দেখানর আবশ্যক হওয়ায়, সব দেখি য়েছেন। তার আবার অবতারের মধ্যে ছোট বড় কি আছে?

পা। আপনার কথায় ত বেড়ে মজা দেখ্‌ছি,—যেন কি দেখ্‌ছি। রামকৃষ্ণজী ভগবান্! আমরা তাঁকে বার তের বৎসর পূর্ব্বে দেখেছি; ছুঁয়েছি, কৈ তায় কি হ'ল?

ভ।—তাঁকে দর্শন ক'রে কিছু হয়নি, এমন কথা মনে আন্‌তে নাই। তোমাদের খুব হ'য়েছে তবে বুঝ্‌তে পারছ না বটে। দুর্ল্লভ জিনিস সহজে পেলে, জিনিসের কিম্মত জানা যায় না, মানুষে তা জান্‌তেও পারে না। তোমাদের কি হয়েছে শুন্‌বে? তোমরা ভববন্ধনে মুক্ত হয়েছ; তার উপর তাঁর কৃপা পেয়েছ, রামকৃষ্ণজীর মহল্লীলা শুন্‌তে লালায়িত হ'য়েছ, আবার সকলের সার তাঁর স্বরূপ জানতে ব্যগ্র হ'য়েছ। মানুষের ভাগ্যে এর চেয়ে আর কি হয়? ঈশ্বরীয় শ্রবণ, ঈশ্বর দর্শন, এই মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষ কামিনীকাঞ্চনের দাস; কামিনীকাঞ্চনের জন্য লালায়িত! তোমরাও বরাবর তাই ছিলে, আজ যে কর্ম্মের ফলে ভগবৎপাদপদ্ম লুব্ধ হয়েছ, সেই কর্ম্মটিই রামকৃষ্ণ দর্শন।

পা। আমরা রামকৃষ্ণজীকে বার তের বৎসরের পূর্ব্বে দর্শন করেছি, কিন্তু এখন যেমন তাঁর কথা শুনতে, তাঁর শ্রীমূর্ত্তি ফুল দিয়ে সাজাতে মনে হচ্ছে, এমন এত দিন হয়নি কেন?

ভ। এর উত্তর—রামকৃষ্ণজী বলতেন, একটী বাড়ীর কার্ণিসে বীজ তোলা ছিল, কালক্রমে অনেক বৎসর পরে বাড়ীটা ভূমিসাৎ হ'ল; তখন ঐ বীজ তাত-বাত পেয়ে অঁাকুরে উঠ্‌লো। তোমাদেরও তাই। এখন সময় হয়েছে। ফল সময়সাপেক্ষ।

পা। আপনার কথা শুনে, আমাদের খুব আশা ভরসা হচ্ছে, আর মন প্রাণ শীতল হচ্ছে।

ভ। এ আমার কথা নয়; আমি যা বল্‌ছি, সব সেই জগৎ-গুরু রামকৃষ্ণজীর কথা; আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে মাত্র! ছাদে বাঘের মুখ থাকে, বৃষ্টি হ'লে লোকে বলে, বাঘের মুখ দিয়ে জল পড়ছে; কিন্তু সে বাঘের মুখের জল নয়, সে আকাশের জল। আমার নিজের কথা, শক্তি, বুদ্ধি, কিছুই নাই,—সব তাঁর।

রামকৃষ্ণজীর একটী অভয়দাতা নাম আছে, সেই নামের মহিমায় তোমাদের আশা ভরসা বাড়্‌ছে। রামকৃষ্ণজী আনন্দ-ময়, তাঁর লীলা কথায় আনন্দস্রোত বয়, তাই তোমাদের আনন্দ হচ্ছে। তোমরা ভাগ্যবান, তাঁকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছ, তাঁকে স্পর্শ করেছ, যার বাড়া নাই তাঁর মহাপ্রসাদ ধারণ করেছ তোমাদের ত লীলা-কথা শুনে আনন্দ হবেই। তাঁর লীলা কথা শ্রবণ কীর্ত্তনের এমন গুণ যে, যদি অতি বদ্ধজীবেও শুনে কি কীর্ত্তন করে, সেও আনন্দ-সাগরে ভাস্‌তে থাক্‌বে। সংক্ষেপে তোমায় বলি শুন,—জগতে এমন জীব কেহই নাই, যে সরল প্রাণে রামকৃষ্ণ নাম করলে পরম আনন্দ না পায়; জগতে এখনও এমন পাপের সৃষ্টি হয়নি যে, একবার সরল প্রাণে রাম-কৃষ্ণ নাম কর্‌লে তা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত না হয়; আর এখনও জগতে এমন ত্রিতাপ জ্বালার সৃষ্টি হয়নি যে, একবার রামকৃষ্ণ নাম কর্‌লে তা শীতল না হয়।

পা। যাঁরা রামকৃষ্ণজীকে দর্শন করেছেন, কিন্তু চিনতে পারেন নি—যে তিনি ভগবান্‌—এমন অবস্থায় সেই সব দর্শকের ভগবান্‌ দর্শন হ'ল কি না?

ভ। তাঁদেরও ভগবান্‌ দর্শন হ'ল। মনে কর, তুমি কাশ্মীরে

শীত-কালে রাত্রিতে গিয়া উপস্থিত হ'য়েছ। তুমি বিদেশী লোক, একটি বাসা খুঁজছ, এমন সময় সহরের ভিতরে একটি কোটালের সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি শশব্যস্তে একটা বাসাবাড়ীর ঠিকানা ব'লে দিলেন। কোটালটি কে জান? তিনি কাশ্মীরের রাজা; কোটালের বেশে দুইএকজন আপনার চেনা লোককে আপনার মত সাজিয়ে, সঙ্গে ক'রে নগর ভ্রমণ কর্‌ছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি ব'ল দেখি, তুমি যাঁর সঙ্গে কথা কইলে, যিনি তোমাকে বাসার ঠিকানা বাতলে দিলেন, তিনি আসলে লোকটি কে? তুমি চিনতে পারলে না ব'লে কি বলবো যে তিনি রাজা নন। তিনি রাজা, কোটালের বেশে মাত্র। তেমনি রামকৃষ্ণজী অখিলের রাজা তবে রামকৃষ্ণবেশে এইমাত্র। ইনিও আপনার সঙ্গে পারিষদদিগে আপনার মত মানুষের বেশ পরিয়ে ধরা সহরে এসেছেন। এইবার তুমি বুঝে দেখ, যে, রামকৃষ্ণজীর দর্শনে তাঁদের ভগবান্ দর্শন হয়েছে কি না?

পা। অতি সুন্দর কথা, বড় আনন্দের কথা। আচ্ছা, না চিনে ঈশ্বর দর্শন করলে কি ঈশ্বর দর্শনের কাজ হয়?

ভ। একটা উনুনের কাছে একজন ঘুমুচ্ছে। রেতের বেলায় ঘুমের ঘোরে যদি তার হাতটা আগুনে পড়ে, তা হ'লে হাতটা পুড়ে কি না? যদি অজান্তে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে, তাহোলে অজান্তে ঈশ্বর দর্শন করলে ঈশ্বর দর্শনের কাজ হবে না কেন?

পা। আপনার কথা শুনে আমার প্রাণটা কেমন কচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, আমি যদি এখুনি রামকৃষ্ণজীকে চিনতে পারি। আর একবার বলুন তাঁকে চিনবার কি উপায়।

ভ। আমি তোমার আগ্রহ দেখে, বেশ বুঝতে পারছি যে, তোমার উপর রামকৃষ্ণজীর অপারকৃপা। তাই এইমাত্র তোমাকে বল্‌লাম যে, ভগবানের অবতারের কোন বিশেষ লক্ষণ নাই, তিনি চিনিয়ে দিলেই তাঁকে চেনা যায়, নচেৎ কার সাধ্য। রামকৃষ্ণজীর শ্রীমুখে শুনেছি রাম যখন বনে যান, তখন তাঁকে কেবলমাত্র সাতটি মুনিতে চিনতে পেরেছিল যে, ইনি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, আর অপর সকলে জানতেন, রাম—রাজা দশরথের ছেলে। শ্রীকৃষ্ণ রহস্য নামক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত নাটক আছে, তাতে দেখা যায় যে, কুরুসভাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কি না, এ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা হয়েছিল। মানুষের কি কথা কৃষ্ণ অবতারে ব্রহ্মা শিব এঁদেরও ভ্রম লেগেছিল।

পা। পরমহংসদেব এমন জিনিস, তবে লোকে অনেক বিপরীত কথা বলে কেন? কেউ কেউ বলে, তিনি মহাত্মা, কেউ কেউ বলে, তিনি একজন সাধু, কেউ বলে সিদ্ধ; আবার কেউ কেউ এমন কথা বলে যে, মুখে বলা যায় না কাণে শুনা যায় না।

ভ। মানুষ, আকারে একরকম হয়েও মানুষ নানা প্রকৃতির। যার যেমন উপলব্ধি, যার যেমন জিনিষ ভিতরে আছে, সে সেই রকম কথা বলে। রামকৃষ্ণজীর একটি গল্প শুন। একজন মহাপুরুষ ভাবে মগ্ন হ'য়ে, বাহ্য-চেতন হারিয়ে, একটি পথের ধারে প'ড়ে আছেন, এমন সময় একজন সাধু দেখে চিনতে পারলেন যে, ইনি মহাপুরুষ। সাধু তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে, তার সেবার জন্য ভাবাবসানের অপেক্ষায় একপাশে বসে রৈলেন। তার কিঞ্চিৎ পরে একজন মাতাল উপস্থিত, সে টল্‌তে টল্‌তে

একবার দাঁড়িয়ে মহাপুরুষকে দেখে বোল্‌লে—বা, এই যে আমার মত ভায়ারও ফলার।

ঠাকুরের আর একটি কথা। যে সূতার ব্যবসা করে, সে সূতা দেখলেই কোন্‌টি কোন্ নম্বরের সূতা ব'লে দিতে পারেন। সাধু—সাধু দেখ্‌লেই চিনতে পারেন।

আর একটি উপমা —যে মুলো খেয়েছে, যার পেটের ভিতর মুলো গজ্ গজ্ করছে, সে ঢেঁকুর তুল্‌লেই খালি মুলোর গন্ধ উঠবে; তেমনি যাদের মনে, প্রাণে, পেটে কেবল কামিনী-কাঞ্চন, যারা সংসারকীট, নেহাত বদ্ধজীব, তাদের মুখে অবিদ্যার ভাব ভিন্ন আর কি বেরুবে? তাদের কথা শুনলে, কাণে হাত দিতে হয়, যে স্থানে থাকে, সে স্থান অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হয়। ঈশ্বর আর অবিদ্যামায়া (কামিনী কাঞ্চন) এই দুটি জিনিস। এ দুটির মধ্যে যার যেটি ইচ্ছা, সে সেটি পায়। নদী যেমন দুকূল বজায় রাখতে পারে না, তেমনি জীব, দুটি একসঙ্গে পায় না। হয় আমিরী নাও, নয় ফকিরি নাও; হয় তেতলা নাও, নয় গাছতলা নাও। কামিনী-কাঞ্চন যারা প্রাণের সাধে নিয়েছেন, তাদের ঈশ্বরের পথে কাঁটা। কাঁমিনী কাঞ্চনের একটা নেশা আছে, সেই নেশায় তার দুয়ার-ধরা সেবকদিগে বুঁধ ক'রে রাখে; মাথাটি তুলতে দেয় না। পানাতে যেমন জল ঢেকে রাখে, মেঘে যেমন চাঁদকে আড়াল ক'রে রাখে, তেমনি মায়া ঈশ্বরকে লুকিয়ে রাখে। ন্যাবা লাগলে যেমন রোগী খালি হল্‌দে রং দেখে, তেমনি মায়া-ন্যাবা ধর্‌লে কামিনী-কাঞ্চনের বর্ণ বই আর কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।

অবিদ্যা মায়ার নেশার আর একটা মহিমা বলি, শুন, নেশা-

টায় পড়্‌লে, অমনি বুদ্ধিটিকে গুলিয়ে দিয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বলি দিয়ে, মানুষকে অমনি ভেঁড়া ক'রে ফেলে; তাদিগে জান্‌তে দেয় না যে, তাদের হদ্দ-মুদ্দ দুর্দ্দশা ও সর্ব্বনাশ হয়েছে। আর একটি কথা, পাগলকে বা ভূতে পাওয়া লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, হাঁ গো, তুমি কেমন আছ? সে যেমন বলে, বেশ আছি, তেম্নি এরাও বলে, বেশ আছি।

এখন যা জিজ্ঞাসা করেছিলে তার উত্তর দিলাম। বেশ বুঝে দেখ, কামিনীকাঞ্চনের নেশা না কাট্‌লে ঈশ্বরের পথে গমন কি ঈশ্বর লাভের কোন উপায় নাই। এমন কি, সিদ্ধপুরুষকে দেখলে তাঁকে শ্রদ্ধা করা দূরে থাক্ বরং কটুকাটব্যই পেয়ে থাকে। ঘোর বদ্ধজীব যারা, তারাই পরমহংসদেবকে অযথা বলে।

পা।—নেশাটা তবে কাটে কিসে?

ভ।—রামকৃষ্ণজী একটা বেশ ঔষধ বাতলে দিয়েছেন। ঔষধটীও আজকাল, তাঁর কৃপায় সহজে পাওয়া যায়। ঔষধটী সাধুসঙ্গ। ঠাকুরের উপমা—যদি কেউ সিদ্ধি কি গাঁজার নেশায় হতচেতন হয়, তা'হলে তাকে যেমন চাল ধোয়ানি জল খাওয়ালে নেশা কাটে, তেমনি যারা অবিদ্যার নেশায় হু'শ হারিয়েছে; তাদের পক্ষে সাধুসঙ্গ একেবারে ডিঃ গুপ্ত,—ভারি দাওয়াই।

পা। কামিনী কাঞ্চনের নেশা কাটাতে হ'লে, যাদের মাগ ছেলে চাকরি বা বিষয়াদি আছে, তা কি ত্যাগ করতে হবে?

ভ। তা কেন? রামকৃষ্ণজী সংসারীকে কামিনী কাঞ্চন ছাড়তে ত বলেন নি। তবে কামিনী কাঞ্চনের আসক্তিটি ছাড়তে বলেছেন। তিনি বলেছেন, কামিনী কাঞ্চনকে

অন্তরে ঠাঁই দিও না। কামিনী কাঞ্চনের উপর ভেসে বেড়িও। কেমন জ্ঞান, যেমন জলের উপর যদি নৌকা থাকে, তা হলে নৌকার কোন হানি হয় না, কিন্তু যদি নৌকার ভিতর জল ঢুকে, তা হলেই নৌকার সর্ব্বনাশ। ধর্ম্মপত্নীকে ঈশ্বর লাভের সহায় মনে কোরো, একটি কি দুটী ছেলে হলেই ভাই বোনের মত থেকো, আর উভয়েই সর্ব্বদা ভগবানের সেবা কোরো। কাঞ্চনকে ডাল ভাতের যোগাড় মনে কোরো। ঈশ্বর লাভ করবার পথে সংসার খুব নিরাপদ স্থান। রামকৃষ্ণজী সংসারে কেল্লার উপমা দিতেন। যেমন কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই করলে বিপক্ষের গোলা গুলি ও অস্ত্রাদি গায়ে লাগে না, ক্ষুধা তৃষ্ণার সময় পান ভোজন করতে পাওয়া যায়, আবার এদিকে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাও চলে, তেমনি সংসারে ভাত ডালের সঞ্চয় থাকায় সময় মত খেতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মপত্নীর সহবাসে কোনও দোষ হয় না; আত্মীয় বন্ধু পরিবারবর্গ আছে, পীড়ার সময় সেবা করে। ফাঁকে বেরিয়ে গেলে, এ সব সুবিধা থাকে না, কিন্তু প্রয়োজন গুলি সব থাকে।

তবে এর ভিতর একটী কথা আছে—আগে সংসারকে চিনতে হয়, তার পর তায় ঢুকতে হয়, নচেৎ ভাঁরি মুস্কিল। কাঁচা মানুষের সংসারে প্রবেশ করা আর হাতে তেল না মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গা একই কথা। হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে যেমন হাতে আঠা লাগে না, তেমনি মনে জ্ঞান ভক্তি মাখিয়ে সংসারে প্রবেশ করলে, কামিনী কাঞ্চনের আসক্তিতে লটপট করাতে পারে না। আগে জ্ঞান ভক্তি অর্জ্জন, পশ্চাৎ সংসারে প্রবেশ।

ঠাকুরের উপদেশ,—গায়ে হলুদ মাখা থাক্‌লে যেমন জলে কুমীরের ভয় থাকে না,তেমনি মনে জ্ঞান ভক্তি থাক্‌লে সংসারে কামিনীকাঞ্চন কিছু কর্‌তে পারে না।

আর একটী উপমা—লুকোচুরি খেলায় যে বুড়ী ছোঁয়, তার যেমন আর চোর হবার ভয় থাকে না, তেমনি ঈশ্বর লাভ ক'রে সংসারে থাক্‌লে আর চোর হ'তে হয় না।

আর একটী উপমা খুঁটি ধ'রে বন্‌বনিয়ে ঘুর্‌লে যেমন পড়বার কোনও আশঙ্কা থাকে না, তেমনি ভগবান্‌কে ধ'রে সংসারে যদি কেউ থাকে, তার আর পতনের ভয় থাকে না।

এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটী কথা—একজন পাড়াগেঁয়ে লোক, সঙ্গে একটী ব্যাগ আর একটী ছাতা। ব্যাগটীতে কাপড়-চোপড় ও পাথেয় আছে; এখানে কলিকাতা সহর দেখ্‌তে এসেছে; এ অতি তাজ্জব সহর; সে পাড়াগেঁয়ে নূতন লোক, এখানে যা দেখে, তাই তার পক্ষে আশ্চর্য্যের জিনিস; হাঁ ক'রে এটি উটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। তখন কোথা যায়, কোথা থাকে, চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে একটা দেউড়িতে ব'সে পড়্‌লো ও কিছুক্ষণ মধ্যেই ভাবনায় ও পথশ্রমে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়্‌লো। একজন জোচ্চোর দেখ্‌লে, লোকটা ভারি আহাম্মক,—হেলায় ব্যাগটি ও ছাতাটি হাতিয়ে স'রে গেল। এ ঘুম থেকে উঠে দেখ্‌লে—সর্ব্বনাশ! ঠিক এই রকম যারা সংসার-সহরে এসেছে, তারা যদি আগে আপনার বাসা-ঘর ঠিক না ক'রে ঘুরে বেড়ায়, তাদের এমনি দশা ঘটে।

ঠাকুরের আর একটী বড় সুন্দর কথা—মাঠে বর্ষাকালে কৃষকেরা ঘুণি রাখে। ঘুণির ভিতর জলের চিক্‌চিকানি খেলা দে'খে,

পুঁটি মাছগুলো তার ভিতর ঢুকে; কিন্তু আর বেরুতে পারে না, তেমনি সংসারে কামিনীকাঞ্চনের চিক্‌চিকানিতে মুগ্ধ হয়ে, বেরুবার পথ না জেনে, যারা সংসার-ঘুণিতে ঢোকে, তাদের পুঁটি-মাছের মত দশা হয়।

সংসারে খুব সাবধান হয়ে চল্‌তে হয়। কামিনীকাঞ্চন নিয়ে খেলা, আর সাপ নিয়ে খেলা একই কথা। গুরুদেবের কাছে মহামন্ত্র ও মহৌষধি না শিখে, তাদের সঙ্গে খেলা কর্‌লে, প্রাণরক্ষার কোনও আশা নাই।

পা। গুরুতে কি এই সব জানিয়ে দেন? কৈ, আমাদের গুরু ত একটি মন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ব'লে দেন নাই! তবে, কি মশায়, রকমারি গুরু আছেন?

ভ। তুমি যা বল্লে, তা বুঝেছি। তুমি যে গুরু ও শিষ্যের কথা বল্লে, সে কেমন জান? যেমন অন্ধের হাত ধ'রে অন্ধের গমন; পরিণামে উভয়েরই পতন অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি শিষ্য ঈশ্বরানুরাগী হয়, তা হ'লে অনুরাগের বলে সে, সেই গুরুর ভিতরেই আসল গুরু বের ক'রে নিতে পারে। এখানকার মতে, গুরু একটি আলাদা আর আসল গুরু একটি আলাদা। আসল গুরুটি কে জান?—ইষ্ট-মূর্ত্তি। মনে কর,—পাখী একটি ডিম পাড়্‌লে। কিছুকাল ঐ ডিমে তা দিতে দিতে, তার ভিতর থেকে একটি ছানা বেরুলো—এখানেও অবিকল তাই। গুরু কাণে মন্ত্র দিলেন; সেই মন্ত্রের মধ্যে একটি ইষ্ট আছেন। এখন সেই মন্ত্রে সাধন, ভজন, ধ্যান, জপ ইত্যাদি তাপ দিতে দিতে, তার ভিতর থেকে শাবকরূপ ইষ্ট-মূর্ত্তি বেরিয়ে পড়েন। যখন ইষ্ট বেরুলেন, তখন আর গুরু নাই। ছানাটি বেরুলে, ডিমটি আর থাকে না।

পা। যদি গুরু,ইষ্ট আলাদা, তবে আপনারা পরমহংসদেবকে কি মনে করেন ?

ভ। এখানে একাধারেই গুরু-ইষ্ট। যত দিন ধরা না দিয়ে খেলা করেন, তত দিন গুরু; যখন ধরা দেন, তখন ইষ্ট। ওখানে যেমন ইষ্ট পেলে আর গুরুরূপ থাকে না, এখানে সেরূপ নয়, ইষ্ট পেলেও রামকৃষ্ণরূপ থাকে।

পা। গুরু কাকে বলে ?

ভ। গুরু এক, গুরু সেই ভগবান্। ভগবান্ ভিন্ন গুরুপদ-বাচ্য আর কেউ নয়। তবে এই গুরু লাভ করবার জন্য পথে যে সকল উপদেষ্টা পাওয়া যায়, তাহাদিগকে উপগুরু বলে। এই উপগুরুর মধ্যে মানুষই যে থাকেন, এমন কথা নয়, পশুও থাক্তে পারে, পাখীও থাক্তে পারে, বৃক্ষ লতাও থাক্তে পারে, আবার দেব-দেবীও থাক্তে পারেন। পথে, এদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, কিন্তু গুরু যখন পাওয়া যায়, তখন আর বড় সম্পর্ক থাকে না। তখন গুরু আর শিষ্য। উপগুরুতে কত দিন সম্পর্ক থাকে আর কখন্ বড় থাকে না, তার একটা উপমা দিয়ে তোমাকে বলি শুন। একটি বরের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন যে গ্রামে বিয়ে হবে, হয় ত সেই গ্রামের একটি অন্য কোন জেতের মেয়ে কি পুরুষ প্রথমে কথা আরম্ভ করে, তাকে দে'খে, বর তখন এই ভেবে মনে মনে আদর করে যে, যে গাঁয়ে আমার বিয়ে হবে, সেই গাঁয়ে এর ঘর। তার পর দেখা-শুনার জন্য প্রতিবাসীরা আসে। বর তখন প্রথম ঘটক বা ঘটকীকে ছেড়ে দিয়ে প্রতি-বাসীদিগকে এই ভেবে মনে মনে আদর করে যে, যাদের ঘরে বিয়ে হবে, এরা তাদের প্রতিবাসী। তার পর যখন পাকা

দেখ্‌বার আবশ্যক হয়, তখন—হয় ক’নের বাপ, কি খুড়ো, কি মামা, কি ভাই, এদের মত লোকের আসার প্রয়োজন হয়। তখন বর, প্রতিবাসীকে ছেড়ে ক’নের বাপ, কি মামা, কি ভাই, এদিগে চিনে। বিয়ে হয়ে গেলে, সব ছেড়ে যায়, থাকে বর আর ক’নে। এখানেও ঠিক সেই রকম, গুরু পেলে আর বড় কেউ থাকে না তখন কেবল গুরু আর চেলা।

রামকৃষ্ণজী বলেন, গুরু ঘটক। নায়ক-নায়িকার সম্মিলন-কাজে যেমন একজন ঘটকের আবশ্যক, ভগবানে ও জীবে মিলনের জন্য তেমনি গুরুর দরকার। এই গুরু রামকৃষ্ণজী। তোমরা শুনেছ, তিনি কৃপা ক’রে একবার ছুঁয়ে দিলেই, লোক আপনার গুরু তাঁর ভিতরে দেখ্‌তে পেতেন। ভগবান্ না হ’লে, কার সাধ্য ভগবান্ দিতে পারে? তিনি আপনি ছুঁয়ে, শক্তি দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিতেন।

রামকৃষ্ণজী কেমন গুরু তোমাকে সংক্ষেপে বলি, শুন,—

রামকৃষ্ণজীকে কেউ একবার ধ’রে, তার পর যদি সে ছেড়ে দেয়, তিনি আর ছাড়েন না; সে ভুল্‌লে তিনি আর ভুলেন না, সে টল্‌লে তিনি আর টলেন না।

রামকৃষ্ণজীকে বন্ধু ব’লে একবার বাঁধন দিয়ে, কেউ যদি খোলে, তিনি আর খোলেন না। রামকৃষ্ণজীর সঙ্গে একবার যার ছোঁয়া-ছোঁই হ’য়ে গেছে, তিনি যে আবার সকের বাজারে কামিনীকাঞ্চনের বেসাৎ কর্‌বেন, সে পথে একবারে কাঁটা।

রামকৃষ্ণজীর ভাবাবেশের আশাবাণী—আমি যাকে ধ’রবো, তাকে নিজের বরণ ধরিয়ে ছাড়্‌বো। কাঁচপোকা আরসুলাকে ধর্‌লে, আরসুলার কাঁচপোকার বর্ণ হয়।

তাঁর আর একটি ভাবাবেশের কথা—আমি জাত-সাপ, যাকে একবার ছোব্‌লাবো, তাকে তিন ডাকের বেশী আর ডাক্‌তে হবে না।

রামকৃষ্ণজী যার গুরু হন, তার আর কোন কর্ম্ম নাই। কেবল বগল বাজিয়ে দুহাত তুলে প্রাণ ছেড়ে ফূর্ত্তি করাই তার কাজ। তার জন্য তরী ঘাটে বাঁধা। সদা-সর্ব্বদা চোখের উপর সে, ঘাটও দেখ্‌তে পাচ্ছে, তরীও দেখ্‌তে পাচ্ছে, আর কাণ্ডারীকেও দেখ্‌তে পাচ্ছে। সে আপনার মনে, মনের মতন খেলে বেড়ায়। মনে জানে, যখন মন যাবে, তখন পার হয়ে চ'লে যাব। সে সংসারে খেল্‌তে ভয় করে না। আগে চোক মুদে খেলে অনেকবার পড়েছে, এখন চোক চেয়ে খেলতে শিখেছে। আগে সংসার ধোঁকার টাঁঠি ছিল, এখন সংসার তার মজার কুঠী হয়েছে।

তোমরাও ত এখন কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ। চোখ মেলে দেখ রামকৃষ্ণজী কি! তিনি শুধু তোমার আমার গুরু নন, তিনি জগদ্‌গুরু। রামকৃষ্ণজী চাঁদা মামা—সকলেরই সমান।

পা এ্যাঁ, রামকৃষ্ণজী সাক্ষাৎ ঈশ্বর! ঈশ্বর-দর্শনের ফল কি?

ভ। পরমহংসদেবের মহা বিশ্বাসী ভক্ত, তোমাদের গিরিশ বাবু, যাঁর মতন কবি ও নাট্যকার এখন আর দেখ্‌তে পাই না, তিনি একখানি গ্রন্থে লিখেছেন, 'কৃষ্ণ-দর্শনের ফল—কৃষ্ণ-দর্শন। আমিও তাই বুঝি।

পা। এটি বড় আশা-ভরসার কথা, আমরা কি আবার ভগবানকে রামকৃষ্ণরূপে দেখ্‌তে পা'ব?

ভ। নিশ্চয় পাবে। দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল হ'লেই দেখ্‌তে পাবে। তাঁর বিগ্রহরূপটিও দেখ্‌তে পাবে, তা ছাড়া আরও রূপ আছে, তাও দেখ্‌তে পাবে। তিনি রূপের সাগর, তাঁর অনেক রূপ আছে।

পা। আমরা রামকৃষ্ণজীর মহাসমাধির কথা শুনেছি। তাঁর শ্রীঅস্থি কলসীমধ্যে যে দিন কাঁকুড়গাছিতে রামবাবুর বাগানে সমাধি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, সে দিন আমরাও ত ছিলেম। সে দেহ ত নষ্ট হয়ে গেছে, আবার কি ক'রে দেখ্‌তে পা'ব?

ভ। ভাই, তুমি রামকৃষ্ণজীকে মনুষ্য জ্ঞান ক'রে কথা বল্‌ছো। তোমাকে বার বার বলেছি যে, তিনি ঈশ্বর। রামকৃষ্ণরূপ তাঁর বিগ্রহরূপ। তাঁর দেহ পাঞ্চভৌতিক হয়েও পাঞ্চভৌতিক নয়। রামকৃষ্ণজীর দেহ চিন্ময় দেহ। দেহখানি চৈতন্যের জমাট বাঁধা। দেহের অণু-পরমাণু চৈতন্যময়, তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তাঁর নরলীলা অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু দেহ অবসান হয় নাই। বিভু-বিলাসের দেহ কখনও নষ্ট হবার নয়। ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তদের বাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্য বিগ্রহরূপ ধরেন আর সেই বিগ্রহরূপ তিনি কখনও নষ্ট করেন না ও সেরূপ কর্‌বার তাঁর অধিকারও নাই। ভগবানের বিগ্রহরূপ ভগবানের নয়, সেটি—ভক্তদের।

তোমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পরমহংসদেবের একটি ভক্তের কথা বলি, শুন। ভক্তটির নাম শ্রীদুর্গাচরণ। ইনি ঠাকুরের লীলাবসানে অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে পড়েন। অন্ন-জল ত্যাগ। তিন চারি দিন উপবাসের পর নরেন্দ্রজী খবর পান।

নরেন্দ্রজীর অতি কোমল হৃদয়, দুর্গাচরণের বাসায় গিয়ে দেখেন যে, তিনি মৃতপ্রায় প'ড়ে আছেন। নরেন্দ্রজী তাঁকে খাওয়াবার জন্য অনেক চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারলেন না। তখন তিনি বলেন, আমাকে কিছু খেতে দাও। দুর্গাচরণ অমনি দোকান থেকে একঠোঙ্গা খাবার এনে দিলেন। নরেন্দ্রজী যে কচুরিটি, কি যে গজাটি এক কামড় খেয়ে তাঁর হাতে দেন, তিনি সেইটিঃখান। নরেন্দ্রজীর উদর পূর্ণ ছিল, কত খাবেন! অবশিষ্ট খাবারগুলি দুর্গাচরণকে খাবার জন্য তাঁর হাতে দিলেন। তিনি "হায় রে পোড়া কপাল" এই কথাটি বল্‌তে বল্‌তে ঠোঙ্গার খাবারগুলি দ্রুতপদে গঙ্গার জলে ফে'লে দিলেন। পরদিন প্রতিবাসীরা অনেক জিদ ও ধরাবাঁধা ক'রে তাঁকে ভাত বসান' করালেন, ভাত যখন ফুটে এলো, তখন দুর্গাচরণ একটা চেলা-কাঠ দিয়ে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলেন, আর এই ব'লে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, "হায় রে, আমার তেমন ঠাকুর চ'লে গেলেন,আর আমি ভাত খাব'!" ঠাকুর দুর্গাচরণকে নাছোড়্‌বান্দা দে'খে,তাঁকে দেখা দিলেন,তার পর তিনি রেঁধে ভাত খান।

পা। আহা! ঠাকুরের কথা যেমন মিষ্টি, ঠাকুরের ভক্তদের কথাও তেম্নি মিষ্টি। রামকৃষ্ণজীর ভক্তদের কথা আরও কিছু বলুন না মশায়!

ভ। তোমার জিজ্ঞাস্য শুনে আমারও খুব আনন্দ হলো। রামকৃষ্ণজীর এমন একটি কৃপা তোমার ভিতরে আছে যে, তাঁর লীলা-কথা তোমাকে বল্‌তে বল্‌তে আমার হৃদয়েও ফোয়ারা উঠ্‌ছে; যা জানি না,তাও ঠাকুর জানিয়ে দিচ্ছেন। তোমার মত

লীলাতত্ত্ব-পিপাসুর সঙ্গ পেয়ে আমিও ধন্য হলাম। রামকৃষ্ণজীর ভক্তদের কথা অতি মধুর, আবার জীবশিক্ষার জন্য তাঁদের সঙ্গে ঠাকুর যে সকল খেলা করেছেন,সে আরও মধুর। শুন্‌লে পাষাণে জল ঝরে, মরা গাছে মঞ্জরী উঠে, অতি বদ্ধজীবেরও চৈতন্য হয়, ভক্তি হয়, তাদের ভবসাগর পার হবার সম্বল হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে ও তাঁহার সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রন্থাদিতে এ সব কথা আছে। সেই সমস্ত গ্রন্থ দেখ্‌লে সকল খবর জান্‌তে পার্‌বে।

পা। আচ্ছা মশায়, তবে এইখানেরই কথাই বলুন। আপনি যে বল্লেন, রামকৃষ্ণজীর রামকৃষ্ণরূপ ছাড়া আরও রূপ আছে, সে কি রকম? তিনি কিরূপেই বা রূপের সাগর হ'লেন?

ভ। রামকৃষ্ণরূপটি আমাদের প্রিয় রূপ। এইটি তাঁর বিগ্রহ রূপ, আর একটি বিরাট্‌রূপ আছে। তাঁর নিরাকার ভাবও আছে। আবার তিনি বলেছেন, সাকার নিরাকার ছাড়া ভগবানের আরও একটি অবস্থা আছে। ভক্তেরা তাঁর বিগ্রহরূপ ভিন্ন অন্য রূপ দেখ্‌তে চান না, কিন্তু তিনি কিছু কিছু না দেখিয়ে ছাড়েন না।

পা। বিগ্রহরূপ রামকৃষ্ণরূপ বুঝ্‌লাম, আর আমরা ঐটিই দেখেছি,—বিরাট্‌রূপ আবার কেমন?

ভ। এই জীব-জগৎ নিয়ে যে রূপটি রামকৃষ্ণজীর বিরাট্‌রূপ। সেই বিগ্রহরূপধারী জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণজী বিরাটে বহু হয়েছেন। স্থাবর, জঙ্গম, বৃক্ষ, লতা, গিরি, নদী, অনিল, অনল আর যাবতীয় প্রাণী যা দেখেছ যা শুনেছ সেই সব তিনি হ'য়েছেন। তিনি সকলের ভিতরে বাহিরে র'য়েছেন। তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই, আর কিছুই নাই। যা কিছু আছে, তা সেই তিনি।

পা। অদ্ভুত কথা!—আপনি কি শাস্ত্রের কথা বোল্‌ছেন আর ঈশ্বরের জায়গায় রামকৃষ্ণ নামটি বসিয়ে দিয়ে, তাঁর মহিমা, অযথাভাবে ব'ল্‌ছেন? না—যা দেখ্‌ছেন, তাই ব'ল্‌ছেন?

ভ। রামকৃষ্ণজীর অপার মহিমা—রামকৃষ্ণজী ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বেশ্বর, রাজরাজেশ্বর। তুমি শাস্ত্রের কথা ব'লে মনে ক'র্‌ছো! আমি, শাস্ত্র কাকে বলে, তার নাম-গন্ধও জানি না—এমন কি রামায়ণ, মহাভারত, যা দোকানী-পশারীতে জানে ও পাঠ করে, আমি এই বয়স লাগাৎ তাও জানি না ও কখন পাঠও করি নাই। আমার ত্রিশ বৎসর যখন বয়স, তখন রামকৃষ্ণজীর দর্শন লাভ করি, তখন পর্য্যন্ত আমি জান্‌তাম না যে, কুরুপাণ্ডব রামায়ণে আছে কি মহাভারতে আছে। একদিন রামকৃষ্ণজী আমাকে ব'ল্‌লেন—হঁ্যাগা, তুমি কি ব্রাহ্ম? আমি সে কথার কিছু জবাব দিতে পার্‌লাম না। তখন পর্য্যন্ত আমি জানি না যে, ব্রাহ্ম কাকে বলে, শাক্ত কাকে বলে, শৈব কাকে বলে; ভগবান্ কাকে বলে—আমি তাও জানি না। তিনি আছেন কি—না—তাও জানি না, আর সে বিষয়ে কখন ভাবিও না। তবে পরমহংসদেবকে দর্শন কর্‌বার এক বৎসর পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে গুরুতে কাণে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়াছেন—যখন মন্ত্র দিলেন, তখন গুরুকে ব'ল্‌লাম, এই যে বার বার মন্ত্র বল্‌লাম, কৈ, কৃষ্ণকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তিনি ব'ল্‌লেন—সে কি তুমি পার্‌বে—পুরশ্চরণ কর্‌তে হয়—আর কত কি কর্‌তে হয়! তুমি গঙ্গাতীরে থাক, স্নানের পর বারো বার মাত্র জপ ক'রো। আমি কথা শুনে কেমন হ'য়ে গেলুম। সেই দিন থেকে কিসে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাই, কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা কর্‌তে পাই; কৃষ্ণের

সঙ্গে একসঙ্গে গুড় রুটী খেতে পাই, এর জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা উঠ্‌লো। কৃষ্ণ যে ভগবান্—এ মনে ক'রে নয়,—কৃষ্ণ যে পারের কাণ্ডারী—এ মনে ক'রে নয়; তবে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণ মনে ক'রে। কৃষ্ণ বেশ দেখ্‌তে,এই মনে ক'রে। তাঁর হাত থেকে বাঁশীটি কেড়ে নিয়ে, তাকে কাঁদাব, এই মনে ক'রে; তার, 'ননীর দেহটি দেখ্‌বো, এই মনে ক'রে—তাঁকে কোলে ক'রে বেড়াব' এই মনে ক'রে; ফুল দিয়ে তাকে সাজাব' এই মনে ক'রে। গুড় রুটী আমার প্রিয় জিনিস, তাই তৈয়ার ক'রে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে খাবো, এই মনে ক'রে—আর কত কি, তোমায় কত ব'ল্‌বো! তখন আমাকে গয়লা ব'লে মনে ভাবতুম—কেউ যদি ব'ল্‌ত, আমি বৃন্দাবন থেকে এলাম—আমি ব্রজবাসী—আমি অম্নি তাকে ব'ল্‌তাম, কানাই কেমন আছে? কখন কখন আমি ব্রজবাসীর মত আপনার মনে মনে হিন্দি ও বাঙ্গলা মিশিয়ে কথা কইতাম। তখন কানাইয়ের গান বাঁধতাম, আবার ব্রজবুলীতে গান বাঁধতাম। এখন আমি রামকৃষ্ণজীর কাছে এসে পড়েছি—রামকৃষ্ণজীর কাছে আসাতে এই বাই বেশী চেগে উঠ্‌লো? রামকৃষ্ণজীকে তিন দিন দর্শন ক'রেই আমি পাকা বুঝলাম যে, যদি কেউ কৃষ্ণ দেখাতে পারেন, তা হ'লে ইনিই পারেন, আর কেউ পারে না। এ সময় আমি মোটেই জানি না যে, সেই কৃষ্ণ—এই রামকৃষ্ণজী। এখন কৃষ্ণের সম্বন্ধে কেমন জ্ঞান জান?—কৃষ্ণ যে মধুর রসের রসিক—তা জানি না; কৃষ্ণ যে পাণ্ডবের রথের সারথি—তা জানি না; কৃষ্ণ যে কংসবধ করেছেন—তা জানি না; কৃষ্ণ যে প্রভাসযজ্ঞের কর্ত্তা—তা জানি না; কৃষ্ণ যে দ্বারকালীলা করেছেন—তা জানি না;

জানি-কানাই যশোদার নীলমণি—জানি-কানাই রাখালদের সঙ্গী, বাঁশী বাজায়, ননী চুরি ক'রে খায়, গোচারণে যায়। গোকুলে সবাই তাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে, রাই আরও ভালবাসে, সে বড় সুন্দর—আমি এই সকল জানি। একটা গান বলি শুন, তা হোলেই ভাবটা বুঝ্‌তে পারবে।

যাওয়ে বৃন্দাবনকি চাঁদ, যাওয়ে গোঠবিহারী।
যাওয়ে প্যারী-মোহনীয়া, যাওয়ে বনওয়ারী।
অলকা-তিলকা-শোভিত ভাল, শোভয়ে গলে বনমাল,
জড়িত বাস তড়িত জাল, গোপীগণ মনোহারী।
মোহনীয়া চূড়া পাখড়ি শিরে, হেলত ডুলত পবনভরে,
আঁখি না পালটি রহতুঁ দূরে, নিরখে গোপনারী।
চরণে নূপুর রুণুঝুণু বাজে, হাসত নাচত রাখালমাঝে,
চন্দ্রমা যেসা তারকামাঝে, ঝলকে কিরণ ডারি।
আগে আগে সব চলত ধেনু, চলত পিছুই বাজাই বেণু,
কবহি হাম পাওয়ে কানু, মোহন মুরলীধারী।

আমার শাস্ত্রজ্ঞানের কথা বোল্‌তে বোল্‌তে কোথায় এসে পড়েছি।

পা। এটা ভারি রগড়ের কথা—বলুন, এতে রামকৃষ্ণজীর জলন্ত মহিমা দেখ্‌তে পাচ্ছি।

ভ। আমি পরমহংসদেবকে একদিনও কোন কথা বলি নাই বা কিছু জিজ্ঞাসাও করি নাই, তবে এইটি জান্‌তাম যে, তিনি যার বুকে হাত দেন, সে তখনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, আর ঐ অবস্থায় সে কৃষ্ণ দেখ্‌তে পায়। আমি ঐ আশায় তাঁর কাছে যেতে লাগ্‌লাম—শুধু যে ঐ আশাটিতে, তাও নয়,

তাঁকে দেখ্‌লে কেমন কেমন হতুম, তাই যেতুম, আর মনে মনে কর্‌তুম, কবে কৃপা ক'রে আমার বুকে হাত দেবেন। কত দিন গেল, তিনি আর বুকে হাত দেন না। আমি আশা ক'রে যাই আর নিরাশ হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ফিরে আসি। জীবনে মোটে দুটি কথা তাঁকে ব'লেছিলুম। একবার একদিন তাঁকে নির্জ্জনে পেয়ে বলেছিলুম, ঠাকুর, আমি বড় কাণা। তাতে তিনি জবাব দিলেন, ঈশ্বর আছেন। আর একদিন তাঁকে বোলে ছিলুম যে ঠাকুর—আপনি আমার ছোঁয়া কুল্‌ফী খেলেন না—আমি বড় অপরাধী। তাতে তিনি মুচ্‌কি হেসে বোল্‌লেন, তুমি যদি দুপুর বেলায় কুল্‌ফী আন্‌তে, তা হ'লে খেতুম; ঠাণ্ডা জিনিস রেতের বেলায় খেলে অসুখ হবে, তাই খাই নাই। আমার সঙ্গে ঠাকুর যে রকম ব্যবহার ক'র্‌তেন, এমন যদি অন্য কোন লোকের সঙ্গে হ'তো, তা হ'লে সে প্রাণ গেলেও আর তাঁর কাছে যেতো না। কত লোকে পায়ে হাত বুলাচ্ছে আর আমি হাত বাড়ালেই, অম্‌নি "হ'য়েছে হ'য়েছে" ব'লে, পা গুটিয়ে নিতেন। কখন কখন পদ-রজ নিতে গেলে পেছিয়ে চ'লে যেতেন আর ব'ল্‌তেন "হ'য়েছে, হ'য়েছে।" তিনি যে, এত তত্ত্ব-কথা ব'ল্‌তেন, আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌তাম না, একধারে চুপ ক'রে ব'সে থাকতাম, আর তাঁকে খালি দেখ্‌তাম। আমার বাপকে আমি যেমন ভয় কর্‌তাম, ঠাকুরকেও তেম্‌নি ভয় কর্‌তাম। আমার বাপের মুখের আদল ঠাকুরের মুখে দেখ্‌তে পেতুম ও এখনও পাই। তোমাকে কত ব'ল্‌বো, অনেক কথা। আমার শাস্ত্র—রামকৃষ্ণজী; আমার জ্ঞান—রামকৃষ্ণজী। শাস্ত্র দেখার মধ্যে রামকৃষ্ণজীকে দেখা। আমি যা ব'লছি—যা তিনি দেখাচ্ছেন

তাই বোল্‌ছি। আমি কারও জায়গায় রামকৃষ্ণজীকে বসাই নাই। আমি রামকৃষ্ণজীর জায়গায় রামকৃষ্ণজীকেই বসাচ্ছি। আমি যা দেখ্‌ছি, তাই বোল্‌ছি।

পা। আপনি রামকৃষ্ণজীকে সকলের ভিতর দেখ্‌ছেন—অদ্ভুত কথা! তিনিই যদি প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীব হয়েছেন, তা হ'লে সেই প্রত্যেক বস্তু বা জীবের ভিতর রামকৃষ্ণজী কেমন ভাবে আছেন?—অংশ কি পূর্ণ?

ভ। বড় অক্ষর না পড়্‌তে শিখ্‌লে, যেমন ছোট অক্ষর পড়া যায় না, তেমনি আগে বিগ্রহরূপ না বুঝ্‌তে পাল্লে বিরাট্‌রূপ বুঝা যায় না। আমি যেমন দেখ্‌ছি, বলি, শুন;—

অগণ্য রকমের ছোট বড় পাত্র যদি সাগরের জলে ডুবিয়ে রাখা যায়, তা হ'লে প্রত্যেক পাত্রের ভিতরে সাগর যেমন ভাবে থাকে, তেমনি রামকৃষ্ণজীকে আমি প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দেখ্‌ছি। এতে পূর্ণ কি অংশ, বুঝে নাও। তবে এই যে ছোট বড় পাত্র দেখ্‌ছো, কোনটায় কম জল ধরে, কোনটায় বেশী জল ধরে, সে শক্তির খেলা মাত্র।

পা। যদি প্রত্যেক ঘটে অর্থাৎ জীবে সেই সাগরের জল, তবে জীবের মধ্যে ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ ইত্যাদি এত রকমারি কেন?

ভ। সে গুণের জন্য। রামকৃষ্ণজীর কথা—জল মাত্রই নারায়ণ। তবে এই জল নানা রকমের। কোন জলে খালি হাত-পা ধোওয়া চলে, কোন জলে স্নান করা চলে, কোন জল এমন পবিত্র যে, তার বিন্দু-পানে কি স্পর্শে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ যায়—আবার এমন জল আছে, যাকে ছোঁয়াও যায় না। এই

রকম, রাম সব ঘটে রয়েছেন,—কোথাও সাধু রাম, কোথাও লম্পট রাম, কোথাও চোর রাম। কোন রামকে নিয়ে আদর কর্‌তে হয়, কোন রামকে দূরে রেখে চল্‌তে হয়।

রামকৃষ্ণজীর অপর উপমা—সেই শ্যামা, কোথাও খাঁড়া ধ'রে শ্রীমন্দিরে; কোথাও বৌ হ'য়ে কোণে ঘোমটা দিয়ে ব'সে, আর কোথাও বারাণ্ডায় হুঁকো হাতে ক'রে রয়েছেন।

"সর্ব্বঘটে বিরাজ করে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।"

যত দিন না রামকৃষ্ণজীর কৃপা হয়, তত দিন এই যে শক্তির খেলা, এ সব কিছুই বুঝা যায় না।

পা। ভগবান্ যখন সকল হয়েছেন, আর তিনি চৈতন্যস্বরূপ, তখন পাহাড়, পাষাণ প্রভৃতি জড়ের মধ্যে চৈতন্যের খেলা কৈ? জীবের দেহখানি জড় বটে, কিন্তু ক্রিয়ায় তার মধ্যে চৈতন্যের খেলা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ভ। দুধকে দই, ক্ষীর, ননী, ঘি প্রভৃতি যে কোন অবস্থায় পরিণত কর না কেন, সকলের মধ্যেই যেমন সেই দুধ বা প্রত্যেকটিই যেমন সেই দুধের অন্যবিধ অবস্থা, তেমনি এক মূল চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ থেকে যা কিছু হয়েছে, সে সকলের মধ্যেই তিনি বা প্রত্যেকটি সেই চৈতন্যের অন্যবিধ অবস্থা। তিনিই আধার, তিনিই আধেয়। স্থূলাবস্থাতে শরীরের উপাদান হয়ে দেহ হয়েছেন, আর সূক্ষ্মভাবে দেহী বা আত্মা হয়েছেন। এ দিকে যেমন সৃষ্টিতে চৈতন্যের অতি সূক্ষ্মাবস্থা মহাকাশ; মহাকাশের স্থূল—আকাশ; আকাশের স্থূল—তেজ; তেজের স্থূল—মরুৎ; মরুতের স্থূল—জল ও জলের স্থূল-ক্ষিতি; তেমনি জীবের শরীর সম্বন্ধে পরমাত্মা সূক্ষ্মাবস্থা, তার স্থূল জীবাত্মা, জীবাত্মার

স্থূল, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, তার স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহ। মায়ার অদ্ভুত খেলা।

পা। এই বল্লেন, ভগবানের খেলা, আবার মায়ার খেলা বোল্‌ছেন? মায়া শুনেছি ভুল, অনিত্য, ঐন্দ্রজালিক মাত্র।

ভ। মন আদির অতীত অতি সূক্ষ্মতম চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ যে শক্তিতে এত স্থূল হ'য়ে এই জীব-জগৎরূপে পরিণত হয়েন, সেই শক্তির নাম মায়া। ভগবান্ যেমন সত্য ও নিত্য, তাঁর মায়াও তেমনি সত্য ও নিত্য। সত্য, নিত্য হ'তে যা জন্মে, তা কি কখন অসত্য ও অনিত্য হয়? এই মায়াশক্তিই লীলাশক্তি। এই শক্তির বলে তিনি লীলা করেন। মায়াশক্তি ঈশ্বরাধীন হ'য়েও ঈশ্বরের চেয়ে মায়ার মহিমা বেশী। মায়া-শক্তির খেলা না থাক্‌লে, ঈশ্বরের সত্তা, ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উপলব্ধির উপায় নাই। লীলাশক্তির খেলা ব্যতীত সৃষ্টিই নাই অর্থাৎ এই জীব-জগৎ নাই। জীব না থাক্‌লে ঈশ্বর থেকেও নাই। যেমন জন্মান্ধের পক্ষে পূর্ণিমার আলো, তেমনি জীবের অসত্তাতে ঈশ্বরের সত্তা থেকেও নাই। মায়াশক্তি সৃষ্টি ক'রে জীবের জননী হয়ে তিনি জীবকে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে, পরে ঈশ্বরকে দেখিয়ে দেন। যেমন দর্পণ-সহায়ে প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়, সেইরূপ জীব মায়াতে সৃষ্ট হয়ে, সেই মায়ার সাহায্যেই ঈশ্বর দর্শন করে। মায়া পথ ছেড়ে না দিলে জীবের ঈশ্বর-দর্শন হয় না।

মায়াশক্তি ইচ্ছাময়ী—লীলাময়ী, এক হয়ে আবার দুভাবে খেলা করেন। এক বিদ্যাশক্তি, আর একটি অবিদ্যাশক্তি। এক শক্তির মধ্যে দুরকম ভাব, সে কেমন জান', রামকৃষ্ণজীর এ সম্বন্ধে

উপমা—বিড়ালের একই দাঁত, সেই দাঁতে আপনার ছেলেকে ধ'রে যখন নিরাপদ্ স্থানে নিয়ে যায়, তখন ছেলের ঘাড়ে মোটেই দাঁত লাগে না, কিন্তু সেই দাঁতে যখন ইঁদুর ধরে, তখন ইঁদুরের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। সেই রকম যখন মায়া বিদ্যাশক্তির দ্বারা জীবকে ধরেন, তখন জীবকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যান, আর যখন অবিদ্যাশক্তির দ্বারা ধরেন, তখন জীবকে একবারে মুগ্ধ ক'রে রাখেন ; হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে সংসারে ফেলে দেন।

লীলাশক্তির সহায়ে সেই এক রামকৃষ্ণজী কিরূপে জীব-জগৎ হয়ে বিরাট্‌রূপী হয়েছেন, তার কথা বল্‌লাম। আর তাঁর নিরাকার অবস্থা, তিনি বল্‌তেন যে, সে কি রকম, তা মুখে বলা যায় না। সেখানে জীব-জগৎ নাই, সৃষ্টি নাই, সব উড়ে যায়। সেখানে তুমি যেমন শুনেছ, মায়া ভুল ও ঐন্দ্রজালিক, তাই।

মায়া ভুল হয়েও সত্য, আর সত্য হয়েও ভুল, এ সম্বন্ধে পরমহংসদেবের একটি সুন্দর মীমাংসা আছে। তিনি বোল্‌তেন, জীব-জগৎ যখন আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, তখন কি ক'রে মিথ্যা বোলে বলি ; আবার শঙ্করের যে মত, সে মতে জীব-জগৎ থাকে না। মীমাংসার কথা যেটি, সেটি এই "এও বটে, তাও বটে,"। ঈশ্বরীয় অবস্থার ইতি হয় না, ভগবান্ এইটি, অপর কিছু নন বা হোতে পারেন না, এমন কথা ব'ল্‌লে তাঁর ইতি করা হয়, তাঁকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

তিনি সব হোতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে সব সম্ভব ; এই ঠাকুরের মীমাংসা।

প্রা। পরমহংসদেব এমন ঠাকুর! আচ্ছা, আপনি যে

বোল্‌লেন, রামকৃষ্ণজীই সেই রাম, সেই কৃষ্ণ,কৈ, তাঁদের মত ত কোন বেশ-ভূষা কি অলৌকিক কার্য্য দেখ্‌তে পাই নাই ; আর লোকেও কেউ বলে না ; তবে হাঁ—তাঁর জল্পনা প্রায় অনেক স্থানে আজকাল হচ্ছে বটে।

ভ। তুমি এই কথা প্রথমেই বলেছিলে, আবার এখন বোল্‌ছো। রামকৃষ্ণজীর সম্বন্ধে এখনও তোমার সন্দেহ রয়েছে। তুমি তাঁকে প্রার্থনা কর, তিনি বুঝিয়ে দেবেন—দেখিয়ে দেবেন।

একটা কথা মোটামুটি বলি, শুন। অবতার-বিশেষে রূপ-বিশেষ হয়। রাম-অবতারে রামরূপ, কৃষ্ণ-অবতারে কৃষ্ণরূপ, এবারে রামকৃষ্ণ অবতারে রামকৃষ্ণরূপ। সব অবতারে সমান বেশ হয় না ও সমান কাজও হয় না। অবতার দুই রকম। এক অবতার ভূভার-হরণের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, আর দুষ্টদমনের জন্য। আর এক অবতার—তাঁকে আদর্শাবতার বলে। এই অবতারের কার্য্য—ধর্ম্ম-সংস্থাপন করা, জীবকে শিক্ষা দেওয়া, আর পতিতের উদ্ধার করা। আদর্শাবতারে ঐশ্বর্য্য ব্যক্ত থেকেও থাকে না ; বেশ-ভূষার আড়ম্বর থেকেও থাকে না ; থাকে কেবল মাধুর্য্য। আদর্শাবতার নিরৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ ও অরূপে রূপবান্। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি এই সম্বন্ধে যা বলে, তোমাকে তা শুনাই—শুন।

"আরে অবিশ্বাসী মন কি কব তোমাকে।
চিরকাল মগ্ন তুমি সন্দেহের পাঁকে॥
যদি না বিশ্বাস তোর, মোর কিবা ক্ষতি।
মুই জানি প্রভু মোর অখিলের পতি॥

ত্রাতা পাতা নেতা পথে হৃদয়বিহারী ।
সংসার-জলধি-জলে পারের কাণ্ডারী ॥
রতন মাণিক মম প্রাণ বুদ্ধি বল ।
সম্পদ-বিপদ্-সখা, সহায় সম্বল ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তত্ত্ব করিতে নির্ণয় ।
তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয় ॥
হউন শ্রীপ্রভুদেব পূজারী ব্রাহ্মণ ।
পর-গৃহবাসী কিংবা, পরান্নে পালন ॥
না হয় হউন তিনি নিরক্ষর বেশ ।
অরূপ অগুণ কিবা উন্মত্ত অশেষ ॥
না হয় হউন, পঞ্চভূত-দেহধারী ।
দীন-হীন-দ্বিজ-সাজ; বালক-আচারী ॥
বসন-ভূষণহীন সামান্যের ন্যায় ।
জীর্ণশীর্ণ কলেবর বেদনা গলায় ॥
যত কিছু থাক্ তাঁয়, না করি বিচার :
ভজিব, পূজিব প্রভু ঠাকুর আমার ॥
চাহ তুমি বেশ-ভূষা ঐশ্বর্য্যদর্শন ।
অঙ্গে কান্তি নবদূর্ব্বাদলের বরণ ॥
রতন কুণ্ডল কানে লম্বমান বেণী ।
বিজড়িত মুকুটেতে নানা রত্নমণি ।
পদে পদে অশ্ব গজ রথ শোভমান ।
পৃষ্ঠদেশে তূণ, করে ধরা ধনুর্ব্বাণ ॥
কনক-বরণা বামে সীতা ঠাকুরাণী ।
হরধনু-ভঙ্গলব্ধ জনক-নন্দিনী ॥

আরে মন নিরৈশ্বর্য্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই রাম এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা॥
চাহ তুমি দেখিবারে, শিরে শিখি-পাখা।
শোভিত সুন্দর ভালে অলকা-তিলকা॥
দুলু দুলু গজমতি অতুল নাসায়।
চন্দ্রমা-কিরণ জিনি কৌস্তুভ গলায়॥
নয়ন দুখানি বাঁকা আকর্ণ-পূরিত ॥
কান্তিময় নীল তনু চন্দনে চর্চ্চিত॥
মনোহর পীতবাস জড়িত তড়িতে।
ভুবনমোহন বেণু ঠামে ধরা হাতে॥
শ্রীরাধার প্রেমে বাঁকা ত্রিভঙ্গিম ঠাম।
গোপীমন-বিরঞ্জন নটবর শ্যাম॥
দুলে গলে বনমালা আপাদলম্বিত।
পীতধড়া গুঞ্জবেড়া অঙ্গে সুশোভিত॥
কনক-নূপুর পায় রুণুঝুণু রব।
রকত উৎপল জিনি চরণ-সৌষ্ঠব॥
পায়ে পায়ে প্রস্ফুটিত কমল-আবলি।
মকরন্দ-গন্ধে ছুটে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি॥
আরে মন নিরৈশ্বর্য্য দেখে পেলি ধোঁকা।
সেই কৃষ্ণ, এই রামকৃষ্ণ রূপে ঢাকা॥
সেই রাম, সেই কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ সাজে।
লীলান্তরে রূপান্তর আপনার কাজে॥
রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয়।
মহল্লীলা শ্রীপ্রভুর সাক্ষী পরিচয়॥

যখন যেরূপ সাজ হয় দরকার।
সে রূপে সে সাজে অবতীর্ণ অবতার ॥
সমভাবে সেই শক্তি বিরাজিত কার্য্যে।
ঐশ্বর্য্যবানেতে যেন, তেন নিরৈশ্বর্য্যে ॥

ভগবান্ যে রূপই ধরুন না কেন, তাঁর সেই রূপে, তাঁর সব রূপ থাকে। দাতাকর্ণের ঘরে যখন বুড় থুরথুরে বামুন হয়ে হাজির, তখন কি তাঁর ভিতরে কৃষ্ণরূপ ছিল না? কৃষ্ণাবতারে হনূকে রামরূপ দেখাতে হয়েছিল। রামকৃষ্ণজীও অনেক রূপ অনেক ভক্তকে দেখিয়েছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতে ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে। রামকৃষ্ণরূপ ছাড়া রামকৃষ্ণভক্তে অন্য রূপ দেখতে চান না। একবার ঠাকুর গিরিশ বাবুকে বল্লেন, "তুই কিছু দেখ্‌বি?" ভক্ত উত্তর কর্‌লেন "তুমি তার ভিতরে থাক্‌বে ত?" প্রভু বল্লেন, "আমি আবার তার ভিতরে কেন থাক্‌বো?" ভক্ত বল্লেন, "তবে আমি দেখ্‌তে চাই না।" ভগবানের অন্য রূপ দে'খে ভগবান্‌কে পরীক্ষা ক'রে লওয়া অপেক্ষা ভগবানে মন অবিশ্বাস আর কিছু নাই। তবে রামকৃষ্ণজী সংশয়চিত্তের সংশয়-বিমোচনের জন্য অনেক পরীক্ষা দিয়াছেন ও অনেক রূপ দেখিয়েছেন।

রামকৃষ্ণজীকে দর্শন কোর্‌লে, সব অবতারকে দর্শন করা হয়। তাঁকে বুঝ্‌লে যাবতীয় বেদ, বেদান্ত, পুরাণাদি ও জগতে যত ধর্ম্ম আছে, সকলেরই মর্ম্ম অবগত হ'তে পারে। রামকৃষ্ণজীর দেহে সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিটি আছে।

আমরি কি মনোহর; সমাধিস্থ কলেবর;
নিশাকর বদন-মণ্ডলে।

অপরূপ শোভা পায়, কিরণ হিল্লোল তায়,
ঝলকে ঝলকে যবে খেলে।
নিরখি শ্রীমুখ-ইন্দু, অন্তরের প্রেমসিন্ধু ;
আধার ছাড়িয়া ছুটে যায়।
তোড়ে ভাসে তার জলে, বহু দূর-দূরাঞ্চলে,
দুই কূলে যে রহে যেথায়॥
কত পথ ছুটে ঢেউ, সন্ধান না জানে কেউ,
বিধিরও বিধানে নাহি লেখা।
মায়া ঈশ্বরের শক্তি, অদ্ভুত তাঁহার কীর্ত্তি,
লীলার ভিতরে আছে ঢাকা॥
কোথা সূর্য্য কত দূরে, কেমনে বিমানে করে,
লবণাম্বু লইয়া সিন্ধুর।
অলক্ষ্যে চালিয়ে কল, ফটিক-নির্ম্মল জল,
চাতকের তৃষা যাহে দূর॥
ধরায় জলধিমালা, শূন্যমার্গে করে খেলা,
ধরিয়া জলদ নামান্তর।
এ বড় বিষম দায়, কিছুই না বুঝা যায়,
কেবা কিবা কোথা কার ঘর॥
এক শক্তি মোটে মূলে, কার্য্যেতে ভিয়ান তুলে,
লক্ষ কোটি সৃষ্টি রকমারি।
দুটি বস্তু সমরূপ, বিশ্বমধ্যে অপরূপ,
শক্তির শকতি বলি হারি॥
একে নাহি মিলে অন্য, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন,
তারে, গুণে, গঠনে, বরণে।

অবিনাশী যাবতীয়, নাহি কিছু শ্রেয়ঃ হেয়,
রূপান্তর গুণান্তর বিনে ॥
চতুর্ম্মুখ হরি হর, যে শক্তির আজ্ঞাপর,
হয়, লয়, যাহার ভিতরে।
সেই শক্তি দিবানিশি, শ্রীপ্রভুদেবের দাসী,
যুক্তকর লীলার আসরে ॥
হেন প্রভু বিশ্বপতি, তাঁহার লীলার গতি,
সাধ্য কার করে নিরূপণ।
আকাশ মাটীর সনে, মিশে গেছে যেইখানে,
সে নয় তাদের আয়তন ॥
শ্রীপ্রভুর লীলা-রাজ্য, মহতী অব্যক্তাশ্চর্য্য,
আদি অন্ত-বিহীন আভাস।
অবিরত যুক্ত করে, যাবতীয় অবতারে,
নিরাপদে মধ্যে করে বাস ॥
রাজ-রাজ রামকৃষ্ণ, বিচারে সকলে তুষ্ট,
বিবাদ-বিদ্বেষ-বিভঞ্জন।
যার যাহা অধিকার, তিল নহে নষ্ট কার,
সমভাবে সকলে পালন ॥
গোকল বেদান্ত আদি, যেখানে যাবৎ বিধি-
মত পথ ব্যক্ত চিরকাল।
সকলে ধরিয়া বক্ষে, সমান যতনে রক্ষে,
কৈলা প্রভু বিশ্ব ধর্ম্মপাল ॥

রামকৃষ্ণজীর সব অলৌকিকত্ব। তাঁর গোটা জীবনটী অলৌকিকত্বে ভরা। তাঁর লৌকিকত্ব কিছুই নাই। তাঁর

কথা এখন পর্য্যন্তও কিছুই হয় নাই। আমি যখন লীলাকথা বোল্‌বো, তখন তোমোকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো যে, আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ রামকৃষ্ণজী অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বে যত অবতার হয়েছেন, আর তাঁরা যা করেছেন, একা রামকৃষ্ণজী সেই সব করেছেন, আবার তার চেয়ে কিছু বেশী করেছেন। এখন কেবলমাত্র তোমাকে রামকৃষ্ণজীর দুই চারিটি উক্তিগীতা বল্‌ছি মাত্র।

এই উক্তিগীতা রামকৃষ্ণজীর মহামন্ত্র-বাক্য। এই উক্তিগুলির ভিতরে রামকৃষ্ণজী বিশ্বজনীন ধর্ম্মের সার তত্ত্ব রেখে গেছেন। মাঘের হিমানী পরমাণুরূপে পড়ে, কিন্তু সেই হিমানীর এত শক্তি যে পাষাণ জরিয়ে ফেলে, তেমনি রামকৃষ্ণজীর অতি সরল কথায় সরল গীতার ভিতর এমনি শক্তি নিহিত আছে যে, অতিবড় পাষাণচিত্ত-বদ্ধজীবে শুন্‌লেও তার অন্তরে অন্তরে, মজ্জায় মজ্জায়, শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ কর্‌বে।

একটি বিষয়কে নেড়ে চেড়ে না দেখ্‌লে বুঝা যায় না। পরমহংসদেবের মহিমা যে এখনও এ দেশের লোকে দেখ্‌তে পান নাই; তার কারণ, কেউ তাঁকে দেখেন নাই। তাঁর মূর্ত্তিমান্ জলন্ত মহিমার মধ্যে থেকে, মহিমা দেখ্‌তে পাই নাই বলাও যা, আর হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে থেকে শীত লাগ্‌ছে না বলাও তা। যাঁদের এমন স্থলেও শীত বোধ হচ্ছে না, তাঁদিগে বুঝ্‌তে হবে যে, তাঁদের শরীরে কিছু বিকার জন্মেছে।

একজন দীন-দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে, নিরক্ষর কৈবর্ত্তের ঠাকুরবাড়ীর পূজারী বামুন এমন সকল কথা ব'লে গেলেন, এমন একটি জীবন দেখিয়ে গেলেন যে, সেই কথার, সেই জীবনের আভাস পেয়ে ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকের অতি উন্নতিশীল

জাতির বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় বৈজ্ঞানিক, বড় বড় ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ মহামান্যেরা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ বা অতি ভক্তিসহকারে তাঁর লীলাস্থান অর্থাৎ কোন্‌খানে তিনি থাক্‌তেন, কোন্‌খানে তিনি বস্‌তেন, কোন্‌খানে তিনি শুতেন, কোন্‌খানে কে তাঁর বিষয় জানেন, কে তাঁর সঙ্গে থাক্‌তেন, সেই সব স্থান ও লোককে দেখ্‌বার জন্য সাত সমুদ্র পার হয়ে দীনভাবে এখানে আস্‌ছেন। রামকৃষ্ণজী যে গাছের তলায় ব'সে অগণ্য সাধন ক'রে যাবতীয় ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হয়েছেন, সেই গাছের পাতা, সেই সিদ্ধস্থানের মাটী কত হাজার হাজার লোকে আপন আপন দেশের আপন বাটীতে নিয়ে গিয়ে, গ্লাস্‌কেসের ভিতর রেখে, আপনাকে পবিত্র মনে কর্‌ছেন। যে দেশের লোকে হিন্দুদিগকে হীনবীর্য্য মনে করেন, পশু অপেক্ষাও নীচ মনে করেন, যে দেশের লোকেরা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী ব'লে, মনে প্রাণে ঘৃণা করেন, যে দেশের লোকে বহুকালাবধি পাদ্‌রী ধর্ম্মোপদেষ্টা এ দেশে পাঠিয়ে দিয়ে হিন্দুদিগকে আলোয় নিয়ে যেতে ব্যবস্থা করেন, আজ সেই সেই দেশের উন্নতিশীল তত্ত্বপিপাসুরা রামকৃষ্ণজীকে যে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর্‌ছেন, ইহা কি একটি অলৌকিক অপেক্ষা অলৌকিক নয়?

বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীরা যখন পরমহংসদেবকে এরূপ পূজা, আরাধ্য ব'লে বুঝ্‌ছেন, তখন এটা বুঝ্‌তে হবে যে, তাঁরা পরমহংসদেবের ভিতরে একটা কিছু নূতন আলো দেখ্‌তে পেয়েছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, সকল দেশে সকল জাতিকে, সকল ধর্ম্মপন্থীকে, সকল তত্ত্বপিপাসুকে যিনি সমানভাবে আলো দেন, তিনি কে? অতি মূর্খকেও, চির-অন্ধকেও স্বীকার

করতে হবে যে, তিনি জগদ্‌গুরু। সেই জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণজী। সেই চাঁদামামা রামকৃষ্ণজী। তিনি যে কি ধর্ম্ম দেখিয়ে গেলেন, যথাসাধ্য তা পরে বোল্‌বো। রামকৃষ্ণজী যে রামকৃষ্ণজী হয়ে জগৎ মুগ্ধ করেছেন, এ কি তাঁর মহিমা নয়? এখানের লোকে দেখ্‌তে যদি না পায়, তা হ'লে বল্‌তে হবে, হয় তাদের চোক-কাণের বিকার ঘটেছে, কি বুদ্ধি বিগ্‌ড়ে গেছে—নয় কোনও কারণে দেখাশুনার পক্ষে একটা বাধা পড়েছে।

হাজার হাজার লোকের চোক-কাণের, বুদ্ধির বিকার, এ কথা ব'ল্লে আমার ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌বার অধিকার আছে যে, যাঁরা রামকৃষ্ণজীকে দেখ্‌বেন, তাঁরা যেন সরল প্রাণে, সাদা মনে ও সহজ বুদ্ধিতে দেখেন। যে বুদ্ধিতে মানুষ ভগবান্ হারিয়েছেন, যে বুদ্ধিতে পরনিন্দা পর-গ্লানিকে সৎজল্পনা ব'লে বুঝে রেখেছেন, যে বুদ্ধিতে অন্তরে দ্বেষ-হিংসার আগুন জ্বেলে রেখে পরম শান্তিভোগ করছেন ব'লে গম্ভীর হয়ে ব'সে আছেন, যে বুদ্ধিতে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনাকে ঠাঁই দিয়ে গজমতিহার পরেছি ব'লে বুঝে রেখেছেন, যে বুদ্ধিতে কামিনীকাঞ্চনের ক্রীতদাস হ'য়ে সমাজের গণ্যমান্য ব'লে বুঝে রেখেছেন, যে বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বপদের বিনিময়ে পশুত্বপদে অভি-ষিক্ত হ'য়ে আপনাকে গৌরবান্বিত ব'লে মনে ক'রে রেখেছেন, যে বুদ্ধিতে প্রাণ ভ'রে একবার মা ব'লে ডাক্‌তে পারেন না, এমন অসরল অপবিত্র, কুট, হীনবুদ্ধি নিয়ে, সেই সৎ অপেক্ষা সৎ, শুদ্ধাপেক্ষা শুদ্ধ, পবিত্র অপেক্ষা পবিত্র রামকৃষ্ণজীকে দেখ্‌তে গেলে কি দেখ্‌বেন? দেখ্‌বেন,—তিনি কৈবর্ত্তের ঠাকুর-বাড়ীর পূজারি বামুন, এক জন পাগল, কতকগুলি রাপে

খেদ্‌ড়ানো ও মায়ে তাড়ানো, সমাজচ্যুত, হেয়, মূর্খ, বকাটে লোকের গুরু, আর শেষে গলার পীড়ায় দেহ রাখ্‌লেন।

আমি মানুষের চোক-কাণের বিকারের কথা বল্লুম। এখন কিসে বাধা দিয়েছে, তার কথা শুন। এক দিন দক্ষিণেশ্বরে গ্রীষ্ম-কালে পঞ্চবটীর শীতল ছায়ায় রামকৃষ্ণজীর কাছে, তাঁর কতক-গুলি ভক্ত ব'সে আছেন। নানা রকমের ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে, এমন সময় কথায় কথায় এঁড়েদহ, দক্ষিণেশ্বর ও বরাহনগরের লোক-দের কথা উঠ্‌লো। ঠাকুরের উপর এঁদের জটিলা-কুটিলার ভাব; তাই একটি ভক্ত কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'কত দূর-দূরান্তরের লোক এসে, এখানে শান্তিলাভ ক'রে যাচ্ছেন, আর এঁরা আসেন না কেন?' ঠাকুর মুখে কোন জবাব না দিয়ে, একটি গাই দড়াবাঁধা ছিল, সেই গাইটীকে দেখিয়ে দিলেন। গাইটী গঙ্গার গর্ভে চড়ায় দড়াবাঁধা ছিল; এখন গঙ্গার জলের দিকে তাকিয়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। গাইটী দে'খে কথার জবাব তখন কেউ বুঝ্‌তে পাল্লেন না। রামকৃষ্ণজীর কি মহিমা! এমন সময় আর চার পাঁচটী ছাড়া-গরু এসে গঙ্গার জলে নেমে গিয়ে ইচ্ছামত জল খেয়ে ডাঙ্গায় উঠ্‌লো। তখন ঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন যে, ঐ গাইটীর ভারি তৃষ্ণা পেয়েছে, কিন্তু বাঁধা রয়েছে, তাই এত কাছে জল, তবু খেতে পাচ্ছে না; আর ঐ গরুগুলি ছাড়া ছিল, তাই তৃষ্ণা পাবামাত্র জল খেয়ে গেল। এখানকার লোকেরা বাঁধা আছে, তাই আস্‌তে পারে না।

ঠাকুর এ সম্বন্ধে আর একটী কথা বল্‌তেন, লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে—দূরে আলো পড়ে। সেই রকম মহাপুরুষদের

কাছের লোকেরা তাঁকে দেখ্‌তে পায় না, দূরের লোকেরা তাঁর ভাবে মুগ্ধ হয়। ঠাকুর আর একটী উপমা দিতেন, ব'ল্‌তেন যে, বাজ-বাটুলের বীচি তলায় পড়ে না, যোজনান্তর দূরে ছিট্‌কে পড়ে, আর সেখানে গাছ হয়। সেই রকম মহাপুরুষদের ভাব দূরেতেই প্রকাশ পায় ও লোকে আদর করে।

শেষ কথা। জীব চার প্রকারের ;—নিত্যমুক্ত, মুক্ত, মুমুক্ষু আর বদ্ধ। নিত্যমুক্ত আদতে মায়ার জালেই পড়ে না। মুক্ত জাল কেটে পালায়। মুমুক্ষু কিসে জাল কাট্‌তে পারে, তার চেষ্টা করে আর বদ্ধ জালে পড়েছে, কিন্তু পালাবার মোটেই গা নাই, বরং কাদার ভিতর লুকুতে চায়! বদ্ধজীবের লক্ষণ—বদ্ধজীব কামিনী-কাঞ্চন বই যে আর কোন জিনিস আছে, তা তার আক্কেলেই নাই। অর্থ উপায় করা, খাওয়া মাখা পরা, আর বংশ বৃদ্ধি করা এইটীই সে জীবনের সার উদ্দেশ্য বুঝেছে।

ভূতে যেমন রাম নাম শুন্‌তে পারে না, বদ্ধজীবও তেমনি ভগবানের কথায় কাণই পাত্‌বে না, বল্‌বে—'শুন্‌লে কি হবে ? চল', বরং খানিক ইয়ারকি দিয়ে আসি। কেউ বলে,—চল',ঘরের কাজ-কর্ম্ম দেখি,ওসব শোন্‌বার সময় আছে, সে বুড় বয়সে। এ যাদের কথা, তারা ত বাপের ঠাকুর ; আবার কেউ কেউ এমন কথা বলে, শুন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হয়। বলে—কৃষ্ণ করেছিলেন, তাই লীলা, আর আমরা করলেই বদ্‌মায়েসী।' এ সকল লোকের কাছে যদি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চূড়া-ধড়া পোরে, হাতে বাঁশী নিয়ে, রাইকে বামে কোরে এসে দাঁড়ান, তবু বিশ্বাস করবে না, বরং বল্‌বে;—'হ্যাঁ গা! তোমরা কোন্ থিয়েটারের—বেশ পোশাকগুলি, ক'রেছ ত।' অবতারে বিশ্বাস হওয়া বড় শক্ত।

ডাক্তার সরকার অত বড় লোক, তিনিই ঠাকুরের কাছে ব'লেছিলেন যে, যিনি চোরাবাণে বালীকে মেরেছেন; যিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে বনে দিয়েছেন, এমন রামকে আমি ভগবান্ ব'ল্‌তে পার্‌বো না।

আর একটা বাধার কথা বলি, শুন। এখনকার লোকে ভারি লেখাপড়া শিখে। সকলেই পণ্ডিত। অনেক প'ড়ে পাণ্ডিত্যাভিমানে হৃদয়টী ভর্ত্তি ক'রে রেখেছে। বিদ্যাধ্যয়নে যিনি নিরহঙ্কার হন, তাঁর অধ্যয়নই অধ্যয়ন, আর এই বিদ্যাধ্যয়নে অবিদ্যার পাক্ খোলে। বিদ্যার উদ্দেশ্যই তাই। বিদ্যায় মহাবিদ্যাকে দেখিয়ে দেয়, কিন্তু যেখানে পাণ্ডিত্যাভিমান এসে জুট্‌লো, সেখানে আরও অবিদ্যার প্যাঁচ বেশী লাগ্‌লো। এই বিদ্যার অহঙ্কারে তাঁর সর্ব্বনাশ যে হয়েছে, এটা তাঁকে আর জান্‌তে দেয় না। অহঙ্কারই একমাত্র ঈশ্বর-পথের কণ্টক। এই অহঙ্কারই মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা।

অহঙ্কার অনেক রকমে হয়, কেবল সরস্বতীর করুণাতেই যে হয়, তা নয়, লক্ষ্মীর কৃপাতেও খুব হয়। আবার দুই বোনে এক জায়গায় যেখানে, সেখানের ত কথাই নাই। অহঙ্কার মানের হয়, কুলের হয়। অবিদ্যা নানাদিকে নানারঙ্গের ডুরি ছেড়েছেন, যাদিগে যেমনে পেয়েছেন, তাদিগে তেমনে বেঁধে কাবু করেছেন।

পা। পরমহংসদেবের পরীক্ষা দেবার কথা কি ব'ল্লেন? তাঁর পরীক্ষা দেওয়া কি রকম?

ভ। সে অনেক কথা, আচ্ছা শুন! দক্ষিণেশ্বরের রাণী রাসমণির কালী-বাড়ীতে পরমহংসদেবের ভ্রাতা রাণীর জেদে

মা-কালী-ভবতারিণীর নিত্য পূজা ও সেবায় ব্রতী হন। তখন পরমহংসদেব জ্যেষ্ঠের নিকটে মধ্যে মধ্যে থাক্‌তেন। একদিন বেড়াচ্ছেন, এমন সময় রাণীর জামাই মথুরবাবু সেই জগমন্মোহন কান্তিমাখা কলেবর, ঈষৎ রক্তিমাধর, ঈষৎ বঙ্কিমনয়ন, বিশালবক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু, বালার্কবৎ রামকৃষ্ণজীকে দর্শন ক'রে একেবারে মনে প্রাণে আকৃষ্ট হন। সোৎসাহে অপরের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লেন, ইনি বড় ভট্‌চায্‌ মহাশয়ের কনিষ্ঠ। মথুরবাবু কনিষ্ঠকে তাঁর কাছে ডেকে আন্‌তে ও মা-কালীর পূজায় ব্রতী কর্‌তে, জ্যেষ্ঠকে বিনয়-সম্ভাষে অনেক জিদ করেন। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের নিকট মথুরবাবুর অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, কনিষ্ঠ ব'ল্লেন, 'আমি বড়মানুষের কাছে যেতে, কি পূজায় ব্রতী হ'তে পার্‌বো না।' মথুরবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হয়ে দিনকত চুপ ক'রে রইলেন।

ঠাকুর-রামকৃষ্ণ ছেলে-বেলা থেকে সুন্দর সুন্দর মাটীর দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি গড়্‌তে জানেন। মৃণ্ময় মূর্ত্তিতে চক্ষুদান দেওয়া তাঁর একটী বিশেষ মহিমা ও শক্তি ছিল। চক্ষুদানে মাটীর মূর্ত্তি জীবন্ত বোধ হোতো। দেশে, গ্রামে পূজোপলক্ষে প্রতিমা গড়া হ'লে আগে গদাই ঠাকুরকে দেখানো হোতো। ঠাকুরের বাল্য নাম গদাই। তিনি প্রতিমার গঠন-দোষ দেখিয়ে দিতেন, কিন্তু চক্ষুদানটী, তিনি নিজে না দিলে কাহারও মনঃপূত হোতো না।

এখানে পুরীতে, তাঁর ভাই যেখানে থাকেন, রামকৃষ্ণজী একটী গঙ্গামাটীর শিব ও একটী বৃষ গ'ড়ে রেখে দিয়েছেন। ঘটনাক্রমে সেটী মথুরবাবুর চক্ষে প'ড়ে গেল। তিনি শিবটী ও ষাঁড়টী দে'খে, ঠিক জীবন্ত ব'লে মনে কর্‌লেন এবং কে গড়েছে,

তার খবরটী নিয়ে রাণীকে গিয়া দেখালেন,আর ব'ল্লেন এটী যাঁর গড়া, তাঁকে যদি মা-কালীর পূজায় রাখা যায়, তা হোলে তিনি শীঘ্র মা-কালীকে জাগ্রত কর্‌তে পার্‌বেন। এই মনে ক'রে তিনি ঠাকুরের জ্যেষ্ঠকে বিশেষ অনুরোধ কর্‌লেন এবং ব'ল্লেন, আপনার ভাইকে মা-কালীর পূজায় রাখ্‌তেই হবে। বড় ভাই বার বার জিদ করায়, ঠাকুর আর না বল্‌তে পার্‌লেন না। ব'ল্লেন, যদি হৃদুকে শুদ্ধ রাখা হয়, তা হোলে আমি থাক্‌বো। মথুরবাবু সে কথা শুনে আনন্দে আটখানা হয়ে, ঠাকুরের আর হৃদয়ের মাসিক বেতন ধার্য্য ক'রে পূজায় নিযুক্ত কর্‌লেন।

মথুরবাবু মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে ঈশ্বরীয় কথা শুনেন, আর তাঁর বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠের গান শুনেন। এই রকমে কিছু দিন কেটে গেল।

ঠাকুর মা-কালীর বেশকারী হলেন। নিত্য নিত্য মা-কালীর নূতন নূতন বেশ করেন। মথুরবাবু ও রাণী দে'খে আশ্চর্য্য হন। তারপর ঠাকুর-পূজার কাজ নিলেন। দিন দিন পূজা কর্‌তে কর্‌তে তাঁর মনে রকম রকম ভাব উঠ্‌তে লাগ্‌লো। মাঝে মাঝে বাহ্য-জগৎ নেই ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌লো, আবার কখন কখন নিজের শরীর পর্য্যন্ত ভুল বোধ হ'তে লাগ্‌লো। মনখানি মায়ের পাছু পাছু ছোটে,আর রসনাটী আকুল হয়ে মা মা করে। কখন কখন মা মা ব'লে এত কাঁদেন যে, চোখের জল মেঝেতে পড়ে। কখন কখন মায়ের গায়ে কেবলই চামর-ব্যজন কর্‌তে থাকেন, আবার কখন মাখন মিছরি নিয়ে 'মা তুই খানা মা' এই ব'লে মা-কালীর মুখের কাছে ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। কখন কখন পূজা কর্‌তে গিয়ে মায়ের পায়ে ফুল না দিয়ে, আপ-

নার মাথায় দিয়ে বাহ্যহারা হয়ে ব'সে থাকেন, কখন বা মা-কালীর নিশ্বাস পড়ছে কি না দেখবার জন্যে নাকের কাছে তুলো ধরেন। কোন দিন বা আরতির সময় কাঁসর-ঘড়ী-বাদ্য শেষ হোলো, নহবৎ নিস্তব্ধ হোলো, ঠাকুরের হাতের ঘন ঘন ঘণ্টা-রব ও পঞ্চপ্রদীপের চালনা আর থামে না। ঠাকুর যেন কলের পুতুল। হৃদয়, ঠাকুরের আবেশ বুঝতে পেরে, তাঁকে ধরেন, আর ঠাকুর বাহ্যহারা হয়ে যান। পুরীর বামুনরা মূর্চ্ছারোগ বুঝলেন। এত দিন, ঠাকুর মানুষের চোখে মানুষ ছিলেন, এইবার পাগল হলেন। সাধারণের প্রকৃতির সঙ্গে না মিললেই কাজেই পাগল।

ক্রমে ঠাকুরের ভাব—মহাভাব দিনের মধ্যে অনেকবার হতে লাগলো। পুরীর বামুনরা এখন পাকা বুঝলেন যে, ঠাকুর মূর্চ্ছা ও উন্মাদ-রোগগ্রস্ত। ঠাকুর অকর্ম্মণ্য ব'লে মথুরবাবুর কাছে বলতে লাগলো। মথুরবাবু মনে মনে নানারকম ভাবেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে সাহস করেন না।

রামকৃষ্ণজীর মহিমা! এমন সময় পুরীতে এক ব্রাহ্মণী এসে জুটে গেলেন। এই ব্রাহ্মণী অদ্ভুত ক্ষমতাশালিনী। ভক্তিগ্রন্থ, পুরাণ, তন্ত্রাদি এঁর সব কণ্ঠস্থ। তান্ত্রিক মতে যাবতীয় সাধন-প্রণালী বিশেষ রকম জানেন। ঠাকুর ঐ ব্রাহ্মণীর কথা একবার বলেছিলেন যে, তিনি চতুর্ব্বেদ—মূর্ত্তিমতী। ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের অঙ্গে ভাব মহাভাব দেখেই, তাঁকে ভগবান্ ব'লে চিনতে পারলেন, আর পুরীতে ঐ কথা রাষ্ট্র করতে লাগলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর কথা প্রথমে কেউ গ্রাহ্য করলেন না। তার পর যখন শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে, লম্বা চৌড়া শ্লোক আওড়াতে লাগলেন, তখন

মথুরবাবুর চমক্ লাগ্‌লো। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণীর বিলক্ষণ পারদর্শিতা দে'খে মথুরবাবু অবাক্ হয়ে গেলেন; আর পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে বড় বড় পণ্ডিত এনে তাঁর সঙ্গে বিচার করাতে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্মণীর কণ্ঠে যেন সরস্বতীর আবির্ভাব হোলো, কোন পণ্ডিতই বিচারে হারাতে পার্‌লেন না। শাস্ত্রে ভাব মহাভাবের যে সব লক্ষণ আছে, সেই সব বাক্য ও শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়ে, আর পরমহংসদেবের মহাভাবের সময় তাঁর অঙ্গে সেই সব লক্ষণ দেখিয়ে দিয়ে ঠাকুরকে ভগবান্ ব'লে সাব্যস্ত কর্‌লেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের উক্তিতে ও ঠাকুরের ভাবের লক্ষণে দেখ্‌লেন যে, সব মিলে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও ঠাকুরকে ভগবান্ ব'লে স্বীকার কর্‌বেন না। পণ্ডিতদের পরাজয়ে, ব্রাহ্মণীর বাক্যে মথুরবাবুর অনেক বিশ্বাস হোলো ও ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বাড়্‌লো, তখন তিনি মা-কালীর পূজা থেকে ঠাকুরকে মুক্তি দিয়ে—মাকালীর সেবার যেমন বন্দোবস্ত, তেমনি ঠাকুরের সেবার বন্দেজ ক'রে দিয়ে নিজের বৈঠকখানায় দোতালার উপর তাঁকে রেখে দিলেন।

হাজার হোক্ মানুষের মন, তাই মথুরের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। রাত্রিকালে পরমা সুন্দরী বেশ্যা এনে ঠাকুরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেন।

পা। পরমহংসদেব বেশ্যা মাগীদের দে'খে কি কর্‌তেন?

ভ। শিশুমতি বালক নির্জ্জনে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী দেখ্‌লে যেমন মা মা করে, আর ভয়ে জড়সড় হয়, তেমনি ঠাকুর মা মা ক'রে একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যেতেন।

পা। আর ঐ মাগীরা?

ভ। মাগীরা কেউ চীৎকার ক'রে পালিয়ে যেতো, কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তো। মথুরবাবু বেশ্যা লাগিয়ে,একবার ঠাকুরের ভারি শক্ত পরীক্ষ. করেছিলেন। লছমীবাই ব'লে একটী বেশ্যা ছিল—সে মুনির মন টলাতে পারতো। সে সুন্দরীও যেম্‌নি,তার ঘর-দুয়ার সাজসজ্জাও তেমনি; ঠিক যেন অপ্সরী। মথুরবাবু একদিন তার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লেন যে, 'তুমি অমুক দিনে সন্ধ্যার সময় তোমার মত আর পনের জন সুন্দরীকে বেশ ক'রে সাজিয়ে, তোমার ঘরে যুটিয়ে রেখ, আমি ছোট ভট্‌চাযকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। কেউ ওঁর মন টলাতে পারে নাই, যদি তুমি পার, তা হোলে আমি বিশেষ পুরস্কার দিব। সে বল্লে, এটা আর আশ্চর্য্য কি? কত বড় বড় মাথা মুড়িয়েছি, এ অতি সামান্য কথা।'

তার পর নির্দ্ধারিত দিনে বাইজীতার ঘরে যত সাজ বেশ ছিল, সব গায়ে দিয়ে,আর ঐ রকম পনের জনকে সঙ্গে নিয়ে,যত রকমের ফাঁদ আছে, সেগুলি সব যোগাড় ক'রে নিয়ে, বাঘিনী শীকার ধর্‌বার জন্যে যেমন থাবা গেড়ে ব'সে থাকে, সেও সেই রকম ক'রে রৈল। মথুরবাবু বিকাল-বেলায় ফেটিং-গাড়ীতে বড় বড় দুটো ঘোড়া জোতালেন, আর ঠাকুরকে বল্লেন, 'চল বাবা! গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসি।' ঠাকুর রাজী হ'লেন। মথুরবাবু গড়ের মাঠে বেড়িয়ে, ঠিক সন্ধ্যার পর যথাস্থানে উপস্থিত। বাহির থেকে খবর নিলেন, সব ঠিক। মথুরবাবু ঠাকুরকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সোরে পড়্‌লেন।

পা। ঠাকুর কি কর্‌লেন?

ভ। ঠাকুর ঘরে ঢুকেই মা মা ক'রে গীত গাইতে গাইতে

সমাধিস্থ হয়ে পড়্‌লেন; একমাত্র পরিধেয় বস্ত্রখানি কোমর থেকে খ’সে গেল; ঠাকুর দিগম্বর।

পা। আর মাগীরা?

ভ। মাগীদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ। কেউ বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লো, কেউ কি কর্‌বে, বুদ্ধিহারা হয়ে হাঁ ক’রে দাঁড়িয়ে রৈল, কেউ বা মুখে জল দিলে, আর কেউ কেউ ‘মথুরবাবু মথুরবাবু’ ব’লে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো। মথুরবাবু তাদের চীৎকার শুনে বুঝ্‌লেন, একটা কি ঘোর বিপদ হয়েছে। এসে দেখেন, ঠাকুর সমাধিস্থ। মাগীরা মথুরবাবুকে বক্‌তে লাগ্‌লো, আর বল্লে, “আহা! এমন ছেলে মানুষকে কি এমন কর্ত্তে হয়।” মথুরবাবু তাদিগকে শান্ত ক’রে দাঁড়িয়ে রৈলেন। ঠাকুরের যেমনি বাহ্য চেতন এলো, অম্‌নি সেই আবেশস্থ অবস্থায় তাঁকে গাড়ীতে নিয়ে পালিয়ে এলেন।

তার পর মথুরবাবু লজ্জায় আর ঠাকুরের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না। মহা বিপদ্!

পা। কি আশ্চর্য্য! মানুষে যদি একটা সুন্দরী যুবতী দেখে, তা হোলে লজ্জা, কুলশীল মনুষ্যত্বের বাইরে বেরিয়ে পড়ে, আর এখানে ঐ রকম ঘোলটা! আমার ত এই কথা শুনে বেশ মনে লাগ্‌ছে যে, বাস্তবিক ভগবান্ ভিন্ন এমন ধারা কেউ পারে না। আমরা থিয়েটারের লোক, আমাদের ঐ বিষয়ে মানুষ চিন্‌তে ত বাকি নাই।

পা। কাঞ্চন দিয়ে কি কখন পরীক্ষা হয়েছিল?

ভ। মথুরবাবু ঠাকুরকে একবার ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চান; ঠাকুর তাতে অস্বীকার হওয়ায় মথুরবাবু

বলেন, বাবা, তুমি যদি নিজে না নাও, তা হ'লে হৃদুর নামে কোম্পানীর কাগজ কিনে দি। ঠাকুর অতি বিরক্ত হ'য়ে বলেন, আমি তাও পারব না। হৃদুর নামে থাক্‌লেও আমার এমন মনে হ'তে পারে যে, ও আমার টাকা, হৃদুর নামে আছে মাত্র। ভাই, ঠাকুরের ত্যাগের চেহারা দেখ', ত্যাগ—কায়-বাক্য মনে। বাক্যে বল্‌ছে লব না, মনও তাই, আবার কায়া-খানিও বল্‌ছে লব না। ঠাকুরের কায়ে ত্যাগের বিষয় চক্ষে দেখা। শ্রীহস্তে টাকা কি পয়সা ছুঁইয়ে দেবা মাত্র হাত এঁকে বেঁকে যেত ও জড় জিনিসের মত, অনেকক্ষণ অসাড় হ'য়ে থাক্‌তো। এ অদ্ভুত ত্যাগের কথা কি কেউ কখন শুনেছ' !!

আর একবার লক্ষ্মী মাড়োয়ারী টাকা দেবার জন্য মহা পীড়াপীড়ি করে। ঠাকুরকে কোনমতে রাজি করাতে না পেরে একদিন টাকার তোড়া নিয়ে হাজির। ঠাকুর টাকা দে'খে ছোট ছেলের মত চীৎকার করেন, অবশেষে বাহ্যহারা! লক্ষ্মী মাড়োয়ারী এই না দে'খে কি একটা মনে ক'রে, তোড়া নিয়ে একবারে পালিয়ে গেল। মথুরবাবু আরও অনেক ঘটনাতে দেখেছিলেন যে, ঠাকুর যেমনি কামিনীতে অনাসক্ত, কাঞ্চনেও তেমনি। ঠাকুরের কাঞ্চনেতে অনাসক্তি দে'খে মথুরবাবু নিজে মুক্তহস্ত হয়ে গেছ্‌লেন। এ সব ঘটনা পরে বল্‌বো।

পা। ভগবান্‌কে দর্শন কর্‌লে সন্দেহ-মোচন হয়; সর্ব্বদা কাছে থেকেও মথুরবাবুর এত সন্দেহ ছিল কেন?

ভ। মথুরবাবু স্বয়ং দেবতাবিশেষ, মা-কালীর পরম ভক্ত; তিনি চিরকেলে ভক্ত, জন্ম জন্ম মায়ের ভক্ত, এখন তিনি রাম-কৃষ্ণলীলায় কাজ কর্‌বেন ব'লে ঠাকুরের সঙ্গে নরদেহ ধ'রে

এসেছেন। তাঁর মনে কোন সন্দেহ নাই। তবে জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য মথুরবাবুর মনে সন্দেহ দিয়ে, ঠাকুর তাঁর সঙ্গে এই রকম খেল্‌ছেন। তিনি দেখাচ্ছেন, মানুষের দুর্ব্বলতা কত দূর দেখ। তিনি দেখাচ্ছেন, মানুষের মনখানা কি রকম দেখ, আর নিজে পরীক্ষা দিয়ে দেখাচ্ছেন, ভগবান্ কেমন দেখ, তিনি নরদেহে এসে কি রকম লীলা করেন দেখ। ভাই, মানুষের ভিতরে এই যে মনখানি আছে, এ বড় মুস্কিলে জিনিস। আবার ঐ মন যদি সোজা হয়, তা হ'লে এমন সুন্দর আর নাই।

পা। মনটা কি? 'মন, মন, চিরকাল বলি বটে, কিন্তু জিনিসটা কি, তা ত কৈ কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই না।

ভ। তুমি মাঝে মাঝে বড় শক্ত কথা তুল্‌ছো। আমি মুখ্যু মানুষ, তোমাকে মনের কথা কি বল্‌বো, তবে ঠাকুর যেমন দেখাচ্ছেন, তেমনি বলি শোন।

বিলাতি যাদুকরের মধ্যে উইলসন্ উৎকৃষ্ট যাদুকর। উইলসন্ সব ভেল্কী জানে, কিন্তু ভেল্কীখেলা একলায় হয় না বোলে, তাই তাঁকে অপরকে সেই নিজের ভেল্কী শিখাতে হয়। যারা শিখে, তাদের মধ্যে এক এক জন এমন উতুরে যায় যে, সে উইল্‌সনের প্রায় সমতুল্য দক্ষ হয়ে পড়ে। এখানেও তেমনি রামকৃষ্ণজীর একটী শক্তি আছে, সেই শক্তির স্বভাব—খালি দুনিয়াতে ভেল্কী খেলা। এই শক্তি যাদিগে নিয়ে ভেল্কী খেলে, তার প্রধান চেলা এই মনখানি। মনখানা সেই শক্তির সর্দ্দার খেলুড়ে। মনের খেলা দেখ্‌তে পেলে, বুঝ্‌তে পাল্লে, তুমি দুনিয়ার খেলা বুঝ্‌তে পার্‌বে ও দেখ্‌তে পাবে।

পা। আপনি ভেঙ্গে বলুন, এ হিঁয়ালির মত লাগ্‌ছে।

ভ। এই মন একটা ভারি মজার জিনিস। এর এক কর্ম্ম খেলা। এ খালি খেল্‌তে চায়। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরে, এ নানা প্রকৃতিতে খেলা করে। এর খেলাও রকমারি; খেলাগুলি দেখ্‌লে সহজে বুঝা যায় না যে, এ সব সেই এক মনের খেলা। এই মন, এক হয়ে রকমারি খেল্‌বার জন্য অনেক হ'য়েছে। জন্ম জন্ম এর খেলা ফুরায় না। একটা দেহে যত পারে খেলে; পরে সেই দেহটা নষ্ট হ'লে সে আপনার খেলার সামগ্রী নিয়ে আবার অন্য একটা টাট্‌কা দেহে ঢুকে। সেই দেহে ফের খেলা করে। মনের একটা ঘুমাবার শয্যা আছে। যত দিন না সেইখানে গিয়া ঘোর সুষুপ্তিতে ঘুমায়, তত দিন খেলার বিরাম নাই। বিছানায় এক-বার ঘুমুলে আর উঠে না।

মনের একটা কোন বিশেষ চেহারা কি বিশেষ স্বভাব নাই। যে যে দেহে খেলা করে, সেই সেই দেহের চেহারায় মনের চেহারা, আর তাদের স্বভাবে মনের স্বভাব; এই সকল দে'খে শুনে, জিনিসটা কি বুঝে নিতে হয়। মন শরীরের মধ্যে রয়েছে, আপন মনে খেলা কর্‌ছে, কিন্তু যদি তাকে ধর্‌তে যাও, কি দেখ্‌তে যাও, তা হ'লে অম্‌নি লুকিয়েছে; ত্রিভুবন খুঁজ্‌লেও ধ'র্‌তে কি দেখ্‌তে পাবে না। এই রকমে যে সে লুকোয়, এও তার খেলা।

মন শরীরের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হ'য়ে র'য়েছে। কেমন তা জান'—ঠিক যেন তিলের ভিতর তেল আছে; ব'ল্‌তে পার না যে, অমুক জায়গাটীতে নাই। মন যদি শরীর থেকে চ'লে যায়, কি শরীরের কোন অংশ থেকে চ'লে যায়, তা হ'লে শরীরে কি শরীরের সেই অংশ জড় হ'য়ে যায়।

উইল্‌সনের বাজীতে ঘোড়ার খেলা দেখেছো ত! মনের তেমনি ঘোড়ার খেলা আছে। ঘোড়ারা তার খুব বশ, যা বলে, ঘোড়ারা তাই শোনে। এই মনটা যেন ঘোড়াদের প্রাণ। যখন ঘোড়ারা আস্তাবলে থাকে, তখন যেন মরা। আর যেমন মন তাদের পীঠে চোড়ে লাগামটী ধরে, অম্‌নি যেন উচ্চৈঃশ্রবা, তড়িতের চেয়েও ছোটে। মনের ঘোড়া পাঁচটা, তাদের নাম কি জান'? চোখ, কান, নাক, জিব আর ত্বক্। মন এদের পীঠে না চোড়্‌লে কেও কোন কাজ ক'র্‌তে পাঁরে না। চোখ দেখ্‌তে পায় না, কান শুন্‌তে পায় না, নাক শুঁক্‌তে পারে না, ত্বক্ অনুভব করতে পারে না। এই ঘোড়ার খেলা, মনের সিদে খেলা। মনের আরও বিস্তর খুব মার-প্যাঁচের খেলা আছে, তা কিছু কিছু বলি শোন'।

সাগরে যেমন নানা রত্ন আছে, মন-সাগরেও তেম্‌নি নানা জিনিস আছে। এই সকল জিনিসের নাম বিষয়-জ্ঞান। ঘোড়ায় চোড়ে যা কিছু দে'খে শুনে শিখে, সেই সব বিষয়-জ্ঞান। মন বিষয়-জ্ঞান ভিতরে রেখে, সাগরের মতন এক বেশে থাকে। যখন যে জিনিস তার দরকার হয়, তখনি নিজে ডুবুরি হ'য়ে, নিজের ভিতরে ডুব মেরে সেই সব জিনিস তুলে আনে। ডুবুরির কাজ যখন করে, তখন লোকে তার নাম দেয় স্মৃতি। আবার ঐ মন যখন ভালমন্দ, সদসদ্‌বিচার কর্‌বার জন্য দুটো হ'য়ে আপনা আপনি ঝগড়া ক'রে শেষে মীমাংসা করে, তখন লোকে তার নাম দেয় বুদ্ধি। আবার যখন ঐ মন পোটো হ'য়ে বিষয়ের পট সকল আপনার ভিতর আঁকে, তখন লোকে তার নাম দেয় চিত্ত। আবার যখন

"আমি" "আমি" ব'লে মেতে বেড়ায়, তখন মনের নাম অহঙ্কার।

মনের নানা রকম সাজ বেশ আছে। তোমরা রঙ্গালয়ের লোক, বেশ জান' যে একজন অভিনেতা রকম রকম পোষাক্ পোরে দর্শকদিগে নানারকমের মূর্ত্তি, প্রকৃতি দেখায়; মনও তেমনি নানারকম বেশ ধরে ও রকমারি খেলা দেখায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির পোষাক পোরে যে যে সব মূর্ত্তি ও প্রকৃতি দেখায় সে সব পৈশাচিক মূর্ত্তি ও প্রকৃতি। এই সব মূর্ত্তিও প্রকৃতি ছেড়ে আবার যখন ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন দেবমূর্ত্তি ধরে। মনের পৈশাচিক মূর্ত্তি, দেহীর পরম শত্রু, আর দেবমূর্ত্তি পরম বন্ধু। মনের পৈশাচিক-বেশ মলিন-বেশ, ঐ বেশে জীবকে বদ্ধ করে! আর দেব-বেশ শুদ্ধ-বেশ. এই বেশে জীবকে মুক্ত করে। মলিন অবস্থাতে মনের স্বভাব কেমন থাকে জান',—ঠাকুর বোল্‌তেন, ঠিক কুকুরের ল্যাজের মত। এই টান',সোজা হ'লো, আর ছেড়ে দাও তখনি কুণ্ডলি পাকিয়ে গেল। মনের দুটী অবস্থা মলিন ও শুদ্ধ। মলিন অবস্থাতে মনকে বিশ্বাস করা যায় না। শুদ্ধ অবস্থায় যদি তাকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে বেঁধে রেখে দেওয়া যায়, তা'হোলে ঠিক থাকে, নচেৎ সংসারে ছেড়ে দিলে আবার মলিন অবস্থায় (অপবিত্র অবস্থায়) গিয়া পড়ে। ঠাকুর ব'ল্‌তেন, যেমন হাতীর গা ধুইয়ে দিয়ে যদি হাতীশালে বেঁধে রাখা যায়, তাহ'লে পরিষ্কার থাকে, নচেৎ ফাঁকে ছেড়ে দিলে আবার গায়ে ধূলা মেখে সেই যেমনি ময়লা গা, তেমনি ময়লা গা ক'রে ফেলে। শুদ্ধ অবস্থায় মনের আর মন নাম থাকে না, তখন তার নাম হয় চৈতন্য। চৈতন্য হ'লে যে

চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময়, সেই চৈতন্যময়ের সাক্ষাৎকার লাভ করে ; তখন আর নীচে নেমে বদ্‌মাইসী ক'র্‌তে পারে না।

মনের একটা স্বভাব—তুমি তাকে যেখানে রাখ্‌বে, সে তখন তার মত হ'য়ে থাকে। জড়ের সঙ্গে রাখ' জড় হ'য়ে থাক্‌বে, চৈতন্যের সঙ্গে রাখ,' চৈতন্য হ'য়ে থাক্‌বে। যেমন অঙ্গারকে মাটীতে ফেলে রাখ্‌লে মাটীর মতন হ'য়ে থাক্‌বে, আবার আগুনের সঙ্গে রাখ,' আগুন হ'য়ে থাক্‌বে।

একটা তারে ঝঙ্কার দিলে যেমন তায় নানা সুর বেরোয়, তেমনি মন, আপনাতে আপনি ঘা দিয়ে নানা সুরে গায়। প্রাণীর শরীর মনের বীণাযন্ত্র। শরীর চারি রকমের—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ। স্থূল শরীরে যখন মন খেলে, তখন কামিনী-কাঞ্চনের পেছু পেছু ঘুরে বেড়ায় ; তখন কামিনীকঞ্চান ছাড়া যে, আর কোন জিনিস আছে, তা তার আক্কেলেই থাকে না। সে তখন খালি জানে, খেতে, ঘুমুতে আর ইন্দ্রিয়-সেবা ক'র্‌তে।

যখন সূক্ষ্ম শরীরে খেলে, তখন দেহীর গা গরম হয়। সে মনের খেলা তখন দেখ্‌তে পায়, সে তখন মনের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে পারে। লড়াই ক'র্‌তে ক'র্‌তে কখন হারে, কখন জীতে। দেহীকে, আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে লড়াই ক'রে মজা করে।

কারণ শরীরে শিষ্ট শান্ত হ'য়ে থাকে, আর দেহীকে ঈশ্বর দর্শনানন্দ ভোগ করায়। আর মহাকারণে নিজে ঘুমিয়ে, জীবকে ঘুম পাড়ায়। এই ঘুমে আপনার রূপ, গুণ, বর্ণ হারায় ; আর দেহীকে পরম শান্তির পদে তুলে দেয়।

এইটি ভাল ক'রে ভেঙ্গে বলি শোন'। সেতারে যেমন

যোলটা পরদা আছে আর কি পরদায় ভিন্ন ভিন্ন স্থুর উঠে, তেমনি দেহ—সেতারে সাতটী পরদা আছে, এই পরদায় পরদায় মন নানা স্থুরে গেয়ে বেড়ায়। পরমহংসদেব ব'ল্‌তেন, প্রথম-কার তিনটী পরদাতে একটী ঘাট হ'য়েছে। মন যখন ঐ তিন পরদায় বাজে, তখন দেহীকে একেবারে বেতালা করে। দেহীর লক্ষ্য কেবল আহার, নিদ্রা আর ইন্দ্রিয় সেবায়। দেহী কামিনী-কাঞ্চনকে বুকের পাঁজর মনে ক'রে বেহুঁশ হ'য়ে থাকে। মন যখন চতুর্থ পরদায় উঠে, তখন দেহীর ঘুম ভাঙ্গা ভাঙ্গা হয়। এই ঘুমুচ্ছে, এই ঘুম ভেঙ্গে চোম্‌কে উঠ্‌ছে। এখন সে জান্‌তে পেরেছে যে, কামিনীকাঞ্চন ছাড়া আরও মজার জিনিস আছে। এইটী চেত-নের ঘর। এই জায়গা থেকে দেহী ঈশ্বরের রাজ্যের আভাস পায়। সে আভাস প্রথম প্রথম মিট্‌মিটে আভাস, ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল বিদ্যুতের মত। এখন আর বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমাবার যো নেই। এই অবস্থায় কিছু দিন গেলে, তার গাটি আরও কিছু গরম হয়। আগে যে ঈশ্বর-রাজ্যের আভাসটী মিট্‌মিটে ছিল, এখন সেটী আলোর মত, কিন্তু চঞ্চলতাও স্থায়ীত্বের সম্বন্ধে বড় ইতর বিশেষ হয় না; সেইজন্য ভগবানের কথায় একাগ্রমন হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। ভ্যান্‌ভেনে মাছির মত ময়রার সন্দেশের থালাতেও বসে, আবার মেথরের ময়লার ভারেও বসে। পঞ্চম ঘরে মন উঠ্‌লে, দেহীর পূর্ব্ব স্বভাব প্রায় বদ্‌লে যায়। এখন তাকে দেখ্‌লে আর আগেকার মানুষ ব'লে চেনা যায় না। এখন আর সে কামিনীকাঞ্চন নিয়ে ঘুমুতে চায় না। মাতালের যেমন মদ্যপানে রোক্‌, এর তেমনি ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ কীর্ত্তনে রোক্‌। এখন তার মন মনের মতন। এখন সে অবিদ্যার কুরূপ দেখ্‌তে

পেয়েছে, মনের খেলার দৌড় বুঝেছে, মনের সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে শিখেছে, মনকে পেছু পেছু ছুটাতে পেরেছে, মনের ভিরকুটী ধ'র্‌তে পেরেছে, মনের পুত্‌লোবাজির খেলার হদিস্ পেয়েছে। ষষ্ঠ ঘরে যখন উঠে, দেহী তখন ঈশ্বর দর্শন কর্‌তে পায়, কিন্তু ঈশ্বরকে ছুঁতে পারে না। ঠাকুর ব'ল্‌তেন, যেমন একটা লণ্ঠনের ভিতরের প্রজ্বলিত দীপশিখা লণ্ঠনের বাহির থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কিন্তু ছুঁতে গেলে লণ্ঠনের কাঁচে বাধা লাগে, তেমনি দেহী এই জায়গায় ব'সে ঈশ্বরকে দেখ্‌তে পায়, কিন্তু ছুঁতে পারে না, একটা আবরণে আটক রাখে। এই অবস্থা দেহীর তুর্ল্লভ অবস্থা। ঠাকুর ব'ল্‌তেন, পাঁচের ঘরে আর ছয়ের ঘরে বাচ্ খেলে বেড়ানো ভারি মজা।

বাচ্ খেলে বেড়ানো কি জান'—গঙ্গায় পান্‌সী নিয়ে তক্-রার ক'রে ঘোড় দৌড়ের মত খেলা করা দেখেছ' ত? এক-বার এধারে আসে, একবার ওধারে যায়, তাকে বাচ্ খেলা বলে। এখানে মনের বাচ্-খেলা একবার ছয়ের ঘরে, এক-বার পাঁচের ঘরে, অর্থাৎ একবার ঈশ্বরকে দর্শন করে, আবার নীচে পাঁচের ঘরে নেমে, সেই দর্শন কীর্ত্তন করে। এর নীচে অর্থাৎ চতুর্থ ঘাটে মজা আদতেই নাই। কেননা অনেক সময়ে অবিদ্যামায়া তাঁর শক্তিতে আচ্ছন্ন রাখেন। আবার এর উপর ঘরে অর্থাৎ সাতের ঘরে মন উঠ্‌লে, দেহীর ভোগ কি আস্বাদ ক'র্‌বার শক্তি থাকে না। এখানে মন মনহারা হয়, আর দেহীর সমাধি হয়। একেই বলে মনের লয়। লয় কেমন জান', এক ফোঁটা গঙ্গাজল নিজের রূপ-গুণ হারিয়ে গঙ্গার জলে মিশে

গেল। মন-রূপ নুনের পুঁতুল গঙ্গা জলে গোলে গেল, এত দিনে মনের খেলা ফুরুলো।

পা। আপনি ত মূর্খ লোক, কোন শাস্ত্র পড়েন নাই, সকলে বলেও তাই, তবে আপনি এত জান্‌লেন কি কোরে?

ভ। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বে বোলেছি, রামকৃষ্ণজীকে দর্শন ক'র্‌লে সব দর্শন হয়, যাবতীয় অবতারের দর্শন হয়। তাঁকে বুঝ্‌লে সব শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা যায়, সাধন-ভজনের ফল মানুষ অনায়াসে প্রায়। তাঁর দর্শনের এমন গুণ যে, একটা বেহুঁশ বদ্ধ জীবের হুঁশ আসে, ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠে, মূর্খ মানুষ পণ্ডিত হয়, কানার চোখ্ ফোটে, কালা শুন্‌তে পায়, খোঁড়া সাগর ডিঙ্গোয়, বোবা বক্তা হয়। তাঁর শ্রীবাক্যগুলি মহামন্ত্র, সেই সব বাক্যের বিষম জোর। যেখানে পড়ে, সে হাজার আঁধার স্থান হোক না কেন, অমনি আলোময় হয়। ঠাকুর ব'ল্‌তেন, চিরকেলে আঁধার ঘরে যদি একবার একটা দেশালায়ের কাটি জ্বালা যায়, তা হ'লে চকিতে যেনগোটা ঘর-টাতে আলোময় হয়, তেমনি ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর কৃপা পড়্‌লেই মানুষের চিরকেলে আঁধার কুটীর নিমেষে আলোকময় হয়ে।

বারুদ আর আগুনের জোরে যেমন ছোট সীসার গোলা, কামানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে একটা পাহাড়কে চুরমার ক'রে দেয়, তেমনি ঠাকুরের কথার ভিতর এমনি শক্তি যে, নিগঢ় মায়ার আবরণ, যাতে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের তত্ত্ব সকলকে আবরণ দিয়ে রেখেছে, সেই আবরণকে একেবারে চূর্ণ ক'রে ফেলে। ঠাকুরের শ্রীবাক্যগুলি গোলার মতন শক্তিধর।

ঠাকুরের শ্রীবাক্যের আর একটা মহিমা বলি শোন'।

লোকে যে কথা কয়, সে যেমন হাওয়ার কথা, হাওয়ায় খোলে, হাওয়ায় দোলে, হাওয়ায় মিশায়, ঠাকুরের কথাগুলি তেমন নয়; কথাগুলি যেমন বেরুলো, তেমনি কানের ভিতর দিয়ে ঢুকে হৃদয়ে পড়্‌লো। যেমনি হৃদয়ে পৌঁছে গেল, অমনি কথিত বিষয়ের একটি প্রতিছবি হৃদয়ে উঠে প'ড়্‌লো, সে কেমন, জান'—যেমন এদিকে ক্যামেরার কলটিও টেপা, আর ওদিকে ছবিটিও উঠা। যার অন্তরে ছবিটি উঠ্‌লো, সে ঠাকুরের কথাটী শুনে আর ছবিটি দে'খে বিষয়টী একেবারে বুঝে নিলে, দেখে নিলে, আবার চিরকালের মত সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌লে। আর লোকে যে কথা কয়, সে হাওয়ার কথা, একান দিয়ে ঢুক্‌লো, আর ওকান দিয়ে বেরুলো; কিছু তার একটা চিহ্ন থাকে না। যেমন যখন জলে জাহাজটা চ'লে যায়, তখনি জলে একটা দাগ পড়ে, তার পরেই সব মিলিয়ে যায়; এত বড় জাহাজটা জলটা দুখানা ক'রে দিয়ে গেল, তার কোন চিহ্নই রৈল না; তেমনি মানুষের কথা, বল্‌বার সময় খুব ধুমধাম কিন্তু একটা চিহ্ন রাখ্‌তে পারে না, মানুষের অন্তরেই ঢুকে না, যদি ঢুকে তো ঠাঁইই পায় না। ছেলেরা জলে খোলামকুচি নিয়ে ছি-নি মি-নি খেলে, খোলামগুলা জলের উপর দিয়ে তর্‌তর্ ক'রে লাফিয়ে চ'লে যায়, জলের ভিতরে আর যায় না।

ঠাকুরের কথার আর একটা মহিমা বলি শোন'। ঐ যে অন্তরে কথার প্রতিমূর্ত্তি উঠ্‌লো, ঐ ছবি জীবন্ত হয়। জীবন্ত হ'য়ে বিণাবিনিন্দিত কণ্ঠে রামকৃষ্ণজীর মহিমা-গীত গায়, অতি মধুর গীত; শুন্‌লে দাবানল জল হয়। কখন্ গায় জান'—

যখন তুমি শোকাকুল হ'য়ে প'ড়েছো ; যখন তোমার অন্তরে অবিদ্যা-মায়া আগুন জ্বালবার চেষ্টা পাচ্ছে,—সেই মুস্কিলের সময়। আর কি করে জান' ; যদি চোর ডাকাতে ধর্‌তে আসে, তা হ'লে পরম বন্ধুর মত, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে, তুমি না ডাক্‌তে ডাক্‌তে আপনি বেরিয়ে এসে, এমন তর্জ্জন গর্জ্জন করে যে, ভয়ে দস্যুরা কোন্ দিকে পালাবে, তার পথ পায় না। অবিদ্যার বাজারে চোর ডাকাতের ত অভাব নাই। কেবল চোর ডাকাতেরই রাজ্য। আনাচে কানাচে চারিদিকে উঁকি মার্‌ছে, এমন সহায় না থাক্‌লে কি আর রক্ষা আছে? এই চোর-ডাকাত কারা জান' ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, আর তাদের ছানাপোনা।

রামকৃষ্ণজীকে দর্শন কর্‌লে, তাঁর কৃপা পেলে গুপ্ত ভগবান্ ব্যক্ত হন ; দূরের ঈশ্বর কাছে হন ; সেই—ঈশ্বর, এই—ঈশ্বর হন ; তিনি—ঈশ্বর, ইনি—ঈশ্বর হন আর দেবদেবীদিগকে ঘরের লোক ব'লে মনে হয়। এখন বুঝ'—রামকৃষ্ণজী কি। তোমরা রামকৃষ্ণজীকে দর্শন ক'রেছ, তাঁর শরণাপন্ন হ'য়েছ, তোমরাও ক্রমে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

পা। আপনি মনের কথা বোল্‌ছিলেন। মন এমন শক্তিধর! মনকেই যে সর্ব্বেসর্ব্বা দেখ্‌ছি। মনের উপর রামকৃষ্ণজীর কোন আধিপত্য নাই?

ভ। মন সর্ব্বেসর্ব্বা নয় ; সর্ব্বেসর্ব্বা রামকৃষ্ণজী। জ্ঞানেন্দ্রিয়দের মুখে লাগাম দিয়ে, মন যেমন তাদের উপর চোড়ে বেড়ায়, তেমনি রামকৃষ্ণজী মনের মুখে লাগাম দিয়ে তার পীঠে চোড়ে বেড়ান। রামকৃষ্ণজী মনকে যা করতে বলেন,

সে তাই করে। মন যে এত লাফিয়ে বেড়ায়, নেচে কুঁদে বেড়ায়, গরম হ'য়ে বেড়ায়, নানা বুজ্‌রুকি ক'রে বেড়ায়, সে খালি রামকৃষ্ণজীর ইচ্ছায়, সে রামকৃষ্ণজীর জোরে; সে কেমন তা জান'; হাঁড়িতে জল, চাল, দাল, দিয়ে জ্বাল দিলে, কিছুক্ষণ পরে চালদালগুলা লাফাতে থাকে! তারা যে লাফায়, সে তাদের বলে নয়, সে আগুনের বলে; সেই রকম শরীর—হাঁড়ির ভিতরে মন, বুদ্ধি যে লাফিয়ে বেড়ায় সে তাদের বলে নয়, সে রামকৃষ্ণজীর শক্তির বলে। এই উপমাটি ঠাকুরেরই উপমা।

পা। রামকৃষ্ণজী যখন এই উপমাটি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তিনি কি ব'লেছিলেন, জীবের শরীরে মন বুদ্ধি তাঁর জোরে লাফিয়ে বেড়ায়—না,—মা-কালীর শক্তিতে লাফিয়ে বেড়ায়? তিনি ত কালী বই আর কিছু জান্‌তেন না।

ভ। তিনি ব'লেছিলেন, মা কালীর জোরে লাফিয়ে বেড়ায়।

যীশু নিজেই সেই পিতা হ'য়ে যেমন সকল বিষয়ে পিতার শক্তি, পিতার ইচ্ছা, পিতার মহিমা, পিতার দোহাই দিতেন; তেমনি রামকৃষ্ণজী নিজে সেই মা হ'য়ে সেই রাম হ'য়ে, সেই কৃষ্ণ হ'য়ে, মায়ের শক্তি, মায়ের ইচ্ছা, মায়ের মহিমা বোল্‌তেন; আবার কৃষ্ণের ইচ্ছা, কৃষ্ণের শক্তি ব'ল্‌তেন; বা কখন কখন রামের শক্তি, রামের ইচ্ছা বোল্‌তেন। তিনি অন্য নামের দোহাই দিয়ে বোল্‌তেন বটে, কিন্তু আমাকে দেখিয়েছেন যে, তিনিই তাই। আমি কালীও জানি না, রামও জানি না, আর কৃষ্ণকেও জানি না। আমি জানি রামকৃষ্ণজী। আবার

রামকৃষ্ণজীকে ধ'রে কালীকেও জানি, রামকেও জানি, কৃষ্ণকেও জানি।

আমার রামকৃষ্ণজী ভিন্ন অন্য কোন বোধ নাই। এক সময় তাঁকে বিগ্রহরূপে দেখেছিলাম, এখন তাঁকে বিরাটরূপে দেখ্‌ছি। এই জীব জগতে তাঁকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি ত বেশ জান', আমি মূর্খ—রামায়ণ মহাভারতও পড়িনি, কোন সাধনও করিনি, কোন একটা কর্ম্মও করিনি। আমার সম্বল রামকৃষ্ণজী। তুমি ঈশ্বরের যে নামই বল না কেন, আমি সেই নামটির ভিতরে রামকৃষ্ণজীকেই দেখ্‌তে পাই, সুতরাং রামকৃষ্ণজী ও তাঁর শক্তি এই ভিন্ন আর কি বল্‌বো?

পা। মনের ভিরকুটি না ভাঙ্গলে, যখন কোন কাজই হবে না, তখন মনকে বুঝা যায়ই বা কি ক'রে আর মনকে ধরাই বা যায় কি ক'রে? মনটাকে জান্‌বার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

ভ। রামকৃষ্ণজীর মহিমা দেখ'; রামকৃষ্ণজীর দর্শন লাভের মহিমা দেখ'; রামকৃষ্ণজীর মহৎ লীলা শ্রবণ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য দেখ'! সাক্ষাৎ মহিমা, মূর্ত্তিমান মহিমা!

এই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে কত শত নানাশাস্ত্রবিশারদ উচ্চ উচ্চ উপাধিধারী পণ্ডিত র'য়েছেন, কত শত রাজভাষাভিজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ পদাভিষিক্ত মহামান্য ব্যক্তি র'য়েছেন, কত শত কুবের সম অতুল ধনসম্পত্তিশালী ধনাঢ্য র'য়েছেন, কত শত নমস্য নানাবেশধারী ধর্ম্মজ্ঞ র'য়েছেন, কিন্তু তুমি যে থিয়েটারের লোক হয়ে উচ্চ ঈশ্বরীয়তত্ত্ব বুঝ্‌বার ও জান্‌বার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ কর্‌ছো ও দেখাচ্ছো, এই

ব্যাকুলতাটী এতাবৎ লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ক জনার হয়েছে? তুমি মহা ভাগ্যবান্, তুমি ধন্য ও রামকৃষ্ণজীর মহিমা ধন্য! রামকৃষ্ণ প্রভুর যে কৃপার বলে হঠাৎ তোমার মনে এতাদৃশ গুরুতর তত্ত্ব উদয় হ'য়েছে, সেই বলেই তোমাকে মনের বিষয় বুঝিয়ে ও জানিয়ে দেবে! রামকৃষ্ণজী পরম দয়াল। তাঁর শরণাপন্ন হ'লে তিনি মনের ভিরকুটী ভেঙ্গে দেন। তুমি কেবল তাঁকে ধ'রে ব'সে থাক'।

পা। তাঁকে ধ'রে বসে থাকা কেমন?

ভ। ঠাকুরের মূর্ত্তিটী স্মরণ কর, ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা কর, আর তাঁর লীলাগুণ কীর্ত্তন কর ও শ্রবণ কর।

পা। এই ক'ল্লেই হবে? আর কিছু কর্‌তে হবে না? শুনেছি কত সাধন ভজন কল্লে, তবে কিছু হয়।

ভ। ভাই! এখনও তুমি রামকৃষ্ণ-দর্শনের ফল কিছুই বুঝ্‌তে পার নাই। রামকৃষ্ণলীলাকথা আন্দোলন যে কি উচ্চ সাধন-ভজন, তা তুমি এখনও জান্‌তে পার নাই। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণজীর শ্রীমূর্ত্তি ফুল দিয়ে, গোড়ের মালা দিয়ে তোমরা যে সাজাও, তার চেয়ে উচ্চ সাধন আমি আর কিছু জানি না। সাধন-ভজন বিনে কিছু হয় না, তা আমি জানি, আর রামকৃষ্ণ-জীও কিছু সাধন-ভজন না করিয়ে ছাড়েন না। তবে রামকৃষ্ণজী যে সাধনা করিয়ে নেন, সে বড় মজার সাধনা। সে সাধনায় মানুষের আয়াস লাগে না, বড় ফুর্ত্তি আছে, আনন্দ আছে। সে কেমন জান', যেমন এক জন লোকের বৃন্দাবন যাবার সাধ হ'য়েছে, রাধাকৃষ্ণ দর্শনের বড় সাধ হ'য়েছে, তার পাথেয় নাই, চ'লে যাবার শক্তিও নাই,—আছে—কেবল সাধটি। এখন

সে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ঘটনা ক্রমে একটী সম্বলওয়ালা লোকের কাছে এসে পড়্‌লো। তিনি তাঁর সাধটীর কথা শুনে বল্লেন—আয় আমার সঙ্গে আয়। সঙ্গে ক'রে হাওড়ার ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে একখানি বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিলেন, পথে যা খাবে, তাও একটী হাঁড়িতে ক'রে যোগাড় ক'রে দিলেন, আবার একটা বিছানারও যোগাড় করে দিলেন, আর বল্লেন—যা, তুই এইবার বৃন্দাবনে যা। রামকৃষ্ণজী এমনি ক'রে সম্বল দিয়ে ইষ্ট-দর্শনে পাঠিয়ে দেন। রামকৃষ্ণজীর কৃপায় এমন অঘটন উপায় যুটে পড়ে।

ঠাকুর ব'ল্‌তেন সরকারি বাতাস বইলে আর পাখার বাতাস দরকার হয় না। এখন সরকারি বাতাস চল্‌ছে, সাধন-ভজনরূপ পাখার বাতাস আবশ্যক নাই। সরকারি বাতাসটি কি, বুঝেছ'? সেটি রামকৃষ্ণজীর কৃপা। তিনি বল্‌ছেন—আমি এখন সশরীরে; এখন কর্ম্মের আবশ্যক নাই। অনায়াসে পাকা ফসল পাবি। এক দিন হরিশ (ঠাকুরের একটি সেবক) পঞ্চবটির তলে ধ্যান কর্‌ছেন, ঠাকুর এখানে শ্রীমন্দির থেকে জান্‌তে পেরেছেন। তখনই সেখানে হাজির; হরিশের বুকে হাত দিয়ে ধ্যান ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন, "ওরে কার ধ্যান ক'চ্ছিস্? আয়—আমার সঙ্গে আয়, পাকা আম খাবি।"

এখন বল' দেখি, কোন্ কালে জীবকে এমন সাহস, এমন আশা কে কখন্ দিয়েছেন! কেবলমাত্র এই ঠাকুরে দেখ্‌ছি। যে গুরু হেলায় একটা জীবকে ইষ্ঠ-দর্শন করান, তাঁর মহিমা আমি কি ব'ল্‌বো। তাঁর কথা বল্‌তে গেলে, ঠোঁটে ঠোঁটে যোড় লেগে যায়।

প্রতাপ হাজরা, আর একটি লোক, ঠাকুরের কাছে ঐ কালীবাড়ীতে থাক্‌তেন। হাজরা এক জন মহাতপস্বী; তপ জপ খুব ভালবাসেন, মালা ধ'রে জপ করা তাঁর যেমন প্রাণ ছিল। হরদম্ জপ চ'লেছে। ঠাকুর কতবার তাঁর হাত থেকে, মালা ছিনিয়ে নিতেন, মালা কর্‌তে কত বাধা দিতেন, আর বোল্‌তেন—এখানে এসেছ', মায়ের ইচ্ছায় সব আপনি হবে; তিন টুস্‌কিতে কাজ হবে। এত মিহানাত কেন? হাজরা কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস কর্‌তেন না। তিনি ঠাকুরের কাছে মালাটি চেয়ে নিয়ে, আবার জপে বস্‌তেন। হাজরা ঠাকুরের কাছে বহুকাল থেকে যুটেছেন। যখন ঠাকুর দেশে শিয়ড়ে হৃদয়ের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে গিয়ে ২।৪ মাস ক্রমান্বয়ে থাক্‌তেন, সেই সময় থেকে হাজরা যুটেছেন। হাজরা রামকৃষ্ণলীলায় একটি বড় মজার জিনিষ। ঠাকুর, হাজরার সঙ্গে খেলা ক'রে অবিশ্বাসী জীবকে ভূরি ভূরি জলন্ত শিক্ষা দিয়েছেন আর নিজের ভক্তদিগে একটা রঙ্গ দেখিয়েছেন। হাজরা যেমন জেতে চাষা, কাজেও অনেকটা তাই দেখালেন। তিনি এটা আর বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেন না যে, ঠাকুরের কৃপায় মানুষ বিনা চাষে ঘরে ব'সে ষোলআনা পাকা ফসল পায়। হাজরার সঙ্গে ঠাকুরের খেলাটি শুন্‌লে, অতি সহজে বিস্তর রামকৃষ্ণমহিমা দেখা যায়; দেখ্‌লে—অতি বড় অবিশ্বাসী হৃদয়েরও ঠাকুরের পাদপদ্মে অটল বিশ্বাস জন্মে; বেদবাক্য অপেক্ষা গুরুবাক্যের গুরুত্ব, গভীরত্ব ও সদ্য ফলদায়ীত্ব শক্তি প্রত্যক্ষ করে, আর একটি বিশেষ কথা—ঠাকুরের শরণাপন্ন হ'লে যে, হেলায় ঈশ্বর-লাভ হয়, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না।

কর্ম্মে :—সাধন-ভজনে যাঁদের বাসনা থাকৃতো,ঠাকুর তাঁদের বাসনা পূরণের জন্য, কাকেও বে ল্‌তেন—তুমি মা কালীর ঘরে তিন দিন কিছু জপ কোরো ; কাকেও বোল্‌তেন—যদি তিন দিন না পার, এক দিন কোরো ; কাকেও বোল্‌তেন—তুমি যদি অন্য জপ ধ্যান করতে না পার, এখানের—(অর্থাৎ ঠাকুরের) স্মরণ, মনন্‌, রেখো ; কাকেও বোল্‌তেন—তোমার কিছু কর্ত্তে হবে না, এখানে এলে গেলেই হবে—এই আজ এসেছ, আর দুদিন এস ; কাকেও বোল্‌তেন –তুমি এক দিন মঙ্গলবারে কি শনিবারে এস, তা হ'লেই হবে। কথন কথন ভাবাবেশে বোল্‌তেন এখানে এসে সরল প্রাণে যে বোল্‌বে, হে ঈশ্বর, তোমার তত্ত্ব বা তোমাকে কি ক'রে জান্‌বো, সে নিশ্চয়ই তাঁর তত্ত্ব পাবে পাবে পাবে। শ্রীমুখে একবার বল্‌লেই যথেষ্ট, তবে যে তিনি তিনবার বল্‌লেন ; এর মানে—এখনকার জীব একেবারে বিশ্বাসহারা, ভক্তিছাড়া, অবিদ্যার রূপে মরা, বিষয়-বিষে জরা ; তবু যদি বিশ্বাস করে, তাই তিনি তিনবার বোল্‌লেন। ঠাকুর বোল্‌তেন, কলির জীবকে ষোলটাং বল্‌লে যদি একটাং নেয়। তাই শিক্ষায় ও কর্ম্মে ঠাকুর ষোলটাং দেখালেন।

যে ঠাকুরের এই কথা, বুঝ' দেখি, তাঁর দয়া করুণার কি আর সীমা আছে ? এতেও মানুষ ঠাকুরকে নিলে না, ঠাকুরের কথায় কান দিলে না। এদের নাম জীব, এদের নাম মানুষ। হে রামকৃষ্ণজী ! আর যা দাও, দিও; যেখানে রাখ্‌তে হয় রেখো, কিন্তু ঠাকুর ! দোহাই তোমার, মানুষের মত বুদ্ধিটি দিও না, আর এমন মানুষের সঙ্গে রেখো না। এই ত মানুষ, সামান্য ধন, মান, যশ, পদের জন্য লালায়িত, কিন্তু ভগবান তুমি কোথা

বা তোমাকে কি ক'রে পাবো, এ কথা কেউ বলে না। এই ত মানুষের বুদ্ধি—কাঞ্চন ফেলে কাঁচের আদর করে; মণির হার ফেলে কালকূটভরা ফণীকে কণ্ঠে পরে। জীবের কথায় প্রাণ শিউরে উঠে। ভাই প্রাণ ভ'রে বল', জয় রামকৃষ্ণজীর জয়।

শুন', প্রাণ জুড়ানো ঠাকুরের কথা শুন'। ঠাকুরের ভাণ্ডার কেমন শুন্', ঠাকুর দয়াল কত শুন', ঠাকুর দাতা কত শুন', ; ঠাকুরের আশা ভরসা দেওয়া কত শুন'. ঠাকুরের মহিমা শুন',— ভাবাবেশে একদিন বোল্‌ছেন,—ওরে যে একবার এসে একটা নমস্কার করবে, তার আর ভয় কি ? ওরে যে শরণাপন্ন হবে, তাকে কিছু কর্ত্তে হবে না। আমি অনেক দিন কঠোর কঠোর তপস্যা, সাধন-ভজন ক'রে আমার ভিতরে একটা ছাঁচ তৈয়ার ক'রে রেখেছি ; ঐ ছাঁচে ফেলে দিব, অম্নি গড়ন হয়ে যাবে ; দেখ্‌বি একেবারে মায় বিবির মুখ শুদ্ধু তায় উঠে গেছে। এই ছাঁচটার সঙ্গে টেঁকশালের কলের উপমা। টেঁকশালে এদিগে রূপার ডেলাটা ফেলে দিলেই, তখনই ওদিকে রাণীর মুখ সহিত ঝক্‌মকে টাকা হ'য়ে বেরিয়ে যায়। ঠাকুরের ছাঁচটিও তেমনি। বুঝ' ভাই—কি ঠাকুর ! কেমন ঠাকুর ! আর কোথাকার ঠাকুর ! এখন চেয়ে দেখ'—কি ঠাকুর দর্শন ক'রেছ, কার মহাপ্রসাদ খেয়েছ'। আর কি সাধনার বাকি রেখেছ'। ভগবান দর্শনের জন্য পূর্ব্বজন্মে কতবার মাথা কেটে আহুতি দিয়েছিলে, সেই ফলে এই ঠাকুরের দর্শন পেয়েছ'। অবিদ্যার নেশায় অনেক দিন ঘুরেছ' ; তাঁর দর্শনে নেশা গেছে, কেবল ঘোরটা খানিক আছে ; ঠাকুরের লীলাকথা আন্দোলন কর, মনের সাদে ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তি ফুল দিয়ে সাজাও, মনের মতন ভোগ দাও,

মনে মুক্ত। হাজার বোঝা, হাজার কাজ থাক্‌লেও মুক্ত পুরুষ বদ্ধ হন না।

পা। যে মন বেঁদে রেখেছে, সেই মনই বাঁধন খুলে দেয়! তাহোলে মনটাকেই যে সর্ব্বেসর্ব্বা দেখ্‌ছি। কিন্তু আপনি পূর্ব্বে ব'ল্লেন, রামকৃষ্ণজী মনের রাজা।

ভ। তুমি প্রভুর কৃপায় খুব লীলা দেখ্‌তে ও বুঝ্‌তে পার্‌ছ'। এখন শোন',—মনে আর ঠাকুরে প্রভেদ কি। তোমাকে পূর্ব্বে ভগবানের সম্রাট ও বিরাট মূর্ত্তির ও খেলার কথা ব'লেছি। বাহ্য-জগৎ ও অন্তর্জগৎ নিয়ে যে খেলা, তার কথাও যথাসাধ্য ব'লেছি। এ অন্তর্জগতের খেলা। একটী কথা বিশেষ ক'রে মনে রেখ'— এই সৃষ্টিতে কেবল সেই একের খেলা। এক মানে রামকৃষ্ণজী। রামকৃষ্ণজী বই আর দোসরা জিনিস নাই। লীলাতে এই এক—মূল—জিনিসটি অগণ্য কোটি রকমে পরিণত হয়েছেন। যেখানে এক, সেখানে আর কথা নাই। যেখানে লীলা অর্থাৎ অনন্ত কোটি, সেইখানেই কথা। লীলা কথার প্রসঙ্গে আত্মা, পরমাত্মা ভগবান্‌, শক্তি, মায়া, মন বুদ্ধি ইত্যাদি যা কিছু আমি বলি না কেন, তুমি বুঝে নিও এই রামকৃষ্ণজী বই আর অন্য কিছু নয়। অবস্থা-ভেদে, রূপ-ভেদে, আকার-ভেদে, গুণ-ভেদে, নাম-ভেদে ও বৃত্তি-ভেদে এই একটি জিনিষ লীলাতে অনন্ত রকমে অনন্ত হ'য়েছেন; সুতরাং লীলা-কথার এই এক জিনিসকে নানা নামে ব'ল্‌তে হয়। এই দুনিয়ায় কেবল একেরই রকমারি—সেটী কেমন জান'—মোটামুটি উপমাতে যেমন একটা কাঠের কারখানা। কারখানএ মূল উপাদান কেবল এক-কাঠ। এই এক-কাঠে

নানা জিনিষ হয়েছে যথা:—বিম, তক্তা, দরজা, আলমারি, খাট, সিন্দূক, বাক্স, কৌটা, জাহাজ, খেল্‌না ইত্যাদি ইত্যাদি। যেখানে শুধু কেবল কাঠ, সেখানে আর রকমারি নাই সুতরাং কথাও নাই; কথার মধ্যে ঐ এক কথা—কাঠ। যেখানে কারখানা, সেইখানেই রকমারি ও তাদের নানা নাম হেতু নানা কথা। কারখানাতে কাঠের জিনিষগুলি সকলেই আকারে, বর্ণে, অবস্থায়, বৃত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন দেখায় বটে, কিন্তু সকলের ভিতরেই সেই এক-কাঠ বা সেই এক-কাঠে তৈয়ারি। এক-কাঠ কারখানাতে নানা রকমারিতে পরিণত হওয়া হেতু যেমন সেই এক-কাঠেরই নানা নাম হ'য়েছে, তেমনি এই এক-রামকৃষ্ণজী, তাঁর লীলা-কারখানাতে স্থূল সূক্ষ্মে নানা ভাবে নানা রূপে পরিণত হওয়া হেতু এই এক-রামকৃষ্ণজীরই নানা নাম হ'য়েছে। সৃষ্টিতে সকলের মধ্যেই এই এক রামকৃষ্ণজী বা সকলগুলিই এই এক-রামকৃষ্ণজী-উপাদানে গঠিত।

এইখানে একটা গান শুন':—

হরে রামকৃষ্ণ বল' রামকৃষ্ণ বল' মন।
রামকৃষ্ণ আমার ভুবনচন্দ্র আলো করেছেন ভুবন॥
যেই রাম যেই কৃষ্ণ, তিনি এই রামকৃষ্ণ, বিশ্বগুরু জগতের ইষ্ট,
আমি দেখিছি পড়েছি স্পষ্ট শ্রীঅঙ্গে আছে লিখন॥
পেলে পরে দেখ্‌বি তারে, সাকারে সে নিরাকারে,
আত্মারূপে সবার ভিতরে, সে চেতনে সেই জড়ে, কারণের মহাকারণ॥
কে রামকৃষ্ণ কোথাকারে, কাজ কি রে তোর সে বিচারে,
তোর বিন্দু-আধার তায় সিন্ধু কি ধরে,
তুই যাবি যদি ভবপারে ভজে নে অভয় চরণ॥

এখন সেই সাবেক মনের কথা। এক পরমাত্মা তিনি

আর বগল বাজিয়ে নাচো। আর বল'— জয় রামকৃষ্ণজীর জয়। এখন তোমরা মুক্ত পুরুষ।

পা। মুক্ত হলেম কি ক'রে? যেমন ছিলাম, তেমনিই রয়েছি—সেই রোগ, শোক, সংসারের খাটুনি, সেই সব রয়েছে, আর ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ভ। পূর্ব্বের নেশার ঘোর আছে কি না? তাতেই এই রকম দেখাচ্ছে,—সেটা কেমন জান' তুমি একটা খুব বলবান ঘোড়ায় চড়েছ' ঘোড়াটা খুব দৌড়ুচ্ছে; এমন সময় মনে কর্‌লে যে, আমি অমুক জায়গাটাতে একে থামাবো; তার মত তুমি দূর থেকে লাগাম টেনে আস্‌ছো; ঘোড়াটাও থেমে থেমে আস্‌ছে বটে; কিন্তু যেখানে থামাবো ব'লে মনে করেছিলে, সেখানে থামি থামি ক'রেও আর দশ হাত এগিয়ে পড়ে। তোমারও তাই ঘটেছে, দশ হাতের ভিতর আছ, কিন্তু থেমে গেছে। এই টুকু গেলেই মুক্ত ব'লে জান্‌তে পার্‌বে।

আর ঐ যে বল্‌লে, যেমন সংসারের খাটুনি, তেমনি রয়েছে। এর উত্তরে ঠাকুরের কথা শুন':—তিনি বোল্‌তেন, কেরাণী জেল থেকে মুক্ত হ'য়ে বেরিয়ে এলে, সে কেরাণীগিরিই কর্‌বে—না—ধেই ধেই ক'রে নেচে বেড়াবে? সংসারী লোক ভগবানের কৃপায় মুক্ত হ'লে সংসারেই থাকে। সংসার কি ভগবান্ ছাড়া? তাঁরই সংসার।

আর রোগ শোকের বিষয়—উনন্‌শালে থাক্‌লেই গায়ে আঁচ লাগে। সংসার জ্বলন্ত চুলো, সেখানে বসত বাড়ী। গায়ে তাপ লাগ্‌বে না—না—গায়ে দাগ লাগ্‌বে না? এ সব সত্ত্বেও জীব ঈশ্বর কৃপায় মুক্ত হয়। নিজের অবস্থায় নিজে বুঝ্‌বে।

পা। মুক্ত হ’য়েও ঘুরূচি, ঐ যে ঘোড়ার উপমা দিয়ে বল্লেন, ওটা বুঝা গেল না ; ওটা কি রকমের ?

ভ। ওটা কি রকমের, অন্য কথায় শুন’। এক জন (হাঁড়িগড়া) কুমোর একটা লাঠি দিয়ে তার চাকাখানা বন্-বনিয়ে ঘুরিয়ে দেয়। লাঠি দিয়ে যতক্ষণ ঘুরুচ্ছিল, ততক্ষণ খুবই ঘুরূছিল ; এখন লাঠিটা ছেড়ে দিয়েছে, তবু চাকা ঘুরূছে। তোমার চাকাতে এত দিন লাঠি ছিল, কিন্তু যেই তাঁকে দর্শন ক’রে ফেলেছ’, অমনি লাঠি তুলে নিয়েছেন, তবে এখনও যে ঘুরূছ’, সে পূর্ব্বেকার পাকের দরুণ। এ ঘুরুনিতে অনেক কাজ আছে। ঠাকুর এই সময়ে আর এক রকমের কতকগুলি বাসন গড়্‌বেন। পরে দেখ্‌তে পাবে।

পা। ঘুরুণিটা কখন্ বন্ধ হবে ? আর হচ্ছে কি না, কি ক’রে জান্‌তে পারূবো ?

ভ। রামকৃষ্ণজী নিজের ভিতরে তোমার মনটা যত টেনে নিবেন তত ঐ ঘুরুণি কম্‌তে থাক্‌বে। যখন সব মনখানা টেনে নিবেন তখন একটা ভারি মজা দেখ্‌তে পাবে। এই সংসারের হেঙ্গাম, শোক, রোগ, ভয় ইত্যাদি এ গুলি থেকেও থাক্‌বে না ; এই শান্তির অবস্থা।

থেকেও নাই—এখন তোমাকে সেটা বুঝাতে পারূবো না। এ অবস্থার কথা, যখন হবে তখন বুঝ্‌বে। তোমার মনই তোমাকে দেখিয়ে দিবে, তোমাকে বুঝিয়ে দিবে। এখন তোমার মন বোল্‌ছে, বাঁধা রয়েছি, মুক্ত কি ক’রে হোলুম ; তখন বোল্‌বে, আমার আবার বাঁধন কিসের, আমি ত চির-কালই মুক্ত। সেইজন্য ঠাকুর বোল্‌তেন—মানুষ মনে বদ্ধ,

বিরাটে বাহিরে বহুধা হ'য়েছেন। এই বহুধা এক রকমে নয়, আকারে, বরণে গুণে ও প্রকৃতিতে। এমন ভাবে তিনি অনন্ত হ'য়েছেন যে, কার সাধ্য বুঝে যে, সেই এক জিনিষ ও একের খেলা। এই এক-জিনিষটীকেই আমরা নানা নামে ডাকি। তিনি পরমাত্মা, তিনিই জীবাত্মা, তিনিই মন ইত্যাদি। তিনিই কখন ঘোড়া ও কখন সওয়ার। তোমাদের রঙ্গালয়ে দক্ষ-যজ্ঞে ভূত সাজে জান' ত? যারা সাজে তারা মানুষ, গায়ে, মুখে, হাতে কালি মেখে ভূত হয়, তেমনি আত্মা গায়ে ময়লা মেখে মন হ'য়ে মনের খেলা খেলে। আবার ঐ জিনিষই কতকগুলি উপাধি নিয়ে জীবাত্মা হ'য়ে থাকে। এই সকল খেলা সব রামকৃষ্ণজীর গুপ্ত-খেলা। তিনি না দেখালে কারো দেখ্‌বার যো নাই। এই ত শুন্‌লে, সব একের খেলা আবার প্রত্যেকটিকেই আলাদা আলাদা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দেহী-রূপে এক রকম হ'য়ে আছেন; আবার মন-রূপে তারই সঙ্গে আর এক রকম হ'য়ে রয়েছেন; আবার আর এক রকম হ'য়ে উভয়কে আলাদা দেখ্‌ছেন। অদ্ভুত খেলা!

পা। দেহীর সঙ্গে মন কি ভাবে আছে? আর মনকে ও দেহীকে পৃথক্ ভাবে যে দেখ্‌ছে, সে কে?

ভ। মন, দেহীর সঙ্গে কেমন ভাবে আছে জান'? যেমন, দুধের সঙ্গে জল আছে, কি ঘি আছে।

মনকে ও দেহীকে যে ভিন্ন বস্তু ব'লে দেখে, সে কে জান? সে ঐ দেহী। সে আপনাকে আপনি দেখে। সে এত দিন মনকে সঙ্গে নিয়ে, তার গায়ে কাদা মাখিয়ে খেল্‌ছিল; এখন সে-খেলা বন্ধ ক'রে, গায়ের ময়লা ধুয়ে, মনকে বিমল ক'রে

তার ভিতর দিয়ে আপনাকে আপনি দেখ্‌ছে। এও তার আর এক রকম খেলা।

যখন আপনাকে আপনি দেখে, তখন এই দেখাটাকে সাধু লোকে আত্মদর্শন বলেন। মনকে সঙ্গে নিয়েই এই দর্শনটি হয়। এখন মনের ইন্দ্রিয়-ঘোড়াগুলা আর নাই। এইখানে একটা মজার কথা শুন'—এই যে একটা "আমি" যে আজীবনটা "আমি" "আমি" ব'লে তর্জ্জন গর্জ্জন ক'চ্ছিল, সেই আমিটা ঐ সময়ে এমন পালায় যে, তার গন্ধ মাত্র থাকে না। ত্রিভুবন খুজ্‌লেও কোথাও তাকে দেখ্‌তে পাবে না।

পা। আপনার কথামত আত্মদর্শন মানে, জীবাত্মার স্ব-স্বরূপ দর্শন। আচ্ছা, এই দর্শন কি চক্ষুর দ্বারা হয়?

ভ। না, বোধ দ্বারা।

পা। এই দর্শন, সাকার কি নিরাকার?

ভ। এক রকম দেখায়, সে কি—মুখে ব'ল্‌তে পাল্লুম না। তবে সে সময়ের অবস্থার আভাস দিতে পারি। যে লোক এই দর্শন করেন, তখন তাঁর অবস্থা কেমন জান'—যেমন একজন গাঁজায় দম্ দিয়ে ভোঁ হ'য়ে ব'সে আছে। এখানে মনের ঘোড়ার খেলা একদম্ বন্ধ। সে খেলা যেন কখনও ছিল না। এখানে সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ কিছুই নাই। এ রাজ্য মহা-শান্তির রাজ্য; তা সে যতক্ষণের জন্যেই হোক না।

পা। এ অবস্থায় ভগবান্‌কে কিরূপ দেখায়?

ভ। ঠাকুর বল্‌তেন, একবার রাম হনূকে জিজ্ঞাসা করেন, হনূমান, তুমি আমাকে কি রকম দেখ'? হনূ বল্লেন হে রাম—তোমাকে কখন দেখি মহাগ্নি, আর আমি তার একটি ফিন্‌কি;

কখন দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস ; আবার কখন দেখি, তোমায় আমায় ভেদ নাই। এখানে ভগবান্‌কে মহাগ্নি দেখায়।

পা। জীবন্মুক্ত অবস্থায় মানুষ কি রকম ভাবে সংসারে থাকে ?

ভ। সে সংসারে ভেসে বেড়ায়, তার ভিতর আর জল ঢুকে না। সে সংসারের সুখ দুঃখে চঞ্চল হয় না, ধ্রুবতারা ভগবানের লক্ষ্যটি হারায় না। তার দেহখানা যে দিকেই টলুক না কেন, মনখানা ঠিক একেবারে কম্পাসের কাঁটার মত ঈশ্বরের পাদপদ্মের দিকে আঁটা থাকে। এই পরম শান্তির অবস্থা। ভগবানের অপার কৃপা না হ'লে, মানুষ এ অবস্থা পায় না। এই জীবন্মুক্তির অবস্থায় আমিটা একেবারে যায় না একটুকু থাকে, কিন্তু সে মরা-আমি হ'য়ে থাকে।

পা। মনখানা, ষোল-আনা রামকৃষ্ণজীর ভিতরে গেলেই যদি সব লেঠা মিটে যায়; তা হ'লে কি ক'রে, শীঘ্র মনখানা তাঁতে যায় ? ইহার উপায় কি ? এখন মনটাকে দেখ্‌ছি, ঠিক মাছির মত, মধুতেও বস্‌ছে, আবার ময়লাতেও বস্‌ছে।

ভ। আগে একেবারেই মধুর ধার দিয়েই যেতো না, কেবল ময়লাতেই থাক্‌তো। এখন যাঁর কৃপায় মধুর স্বাদ পেয়েছে, তাঁরই কৃপায় সময়ে মৌমাছির মত স্বভাব পেয়ে অবিরত মধুতেই থাক্‌বে! তুমি এখন তাঁতে লেগে থাক'! তা হ'লেই সব হ'য়ে যাবে। ঠাকুর একটী গান কর্‌তেন,

হরি সে লাগি রহরে ভাই!
তেরা বনত বনত বনি যাই॥

অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে, তারে সুদন কসাই,
শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাই ॥
দৌলৎ ত্বনিয়া মালখাজনা, বেনিয়া বয়েল চালাই,
এক বাৎসে ঠাণ্ডা পড়েগা খোঁজ খবর না পাই ॥
ষ্যাসি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই,
সেবা বন্দি আওর অধীনতা, সহজে মিলি রঘুরাই ॥

ঠাকুর আর একটি সুন্দর উপমা দিতেন। বর্ষাকালে মাঠ একেবারে ডুবে যায়, তখন মাঠ আর দেখা যায় না; মাঠ যেমন পুকুর! তখন মাঠ কি করে? সে কেবলমাত্র রাতদিন আকাশ-পানে তাকিয়ে চুপ্ ক'রে প'ড়ে থাকে; সময়ে সে দেখ্‌তে পায় যে, যে জলে তাকে ডুবিয়ে রেখেছিল, সে জল আর নাই, সব শুকিয়ে গেছে - তুমিও তেমনি রামকৃষ্ণজীর মুখপানে তাকিয়ে ব'সে থাক'; সময়ে দেখ্‌তে পাবে যে, যে কামিনীকাঞ্চনের রসে তোমার মনকে ডুবিয়ে রেখেছে, সে রস আর নাই।

ঠাকুর আর একটী কথা বল্‌তেন—হে জীব! তোমার দুটী হাত, একটী ঈশ্বরের পাদপদ্মে রাখ', আর একটী সংসারে রাখ', যার বেশী জোর, সে পরে টেনে নেবে।

পা। পরমহংসদেবের কথাগুলি কি সুন্দর! আমরা নেশাখোর লোক, তার উপর বেশ্যাদের সঙ্গে ব্যবসা—তারও একটা মৌতাত আছে, কিন্তু যতক্ষণ এঁর কথা শুনি ততক্ষণ সে সব কিছুই মনে থাকে না। মনটাকে যেন তাঁর কথায় একেবারে ভুলিয়ে রাখে। এই বয়সে অনেক রকমের কথা শুনেছি কিন্তু এমন মন-মজানো কথা কোনটিই নয়। যত শুন্‌ছি, তত

আরও শুন্‌তে মন যাচ্ছে, অথচ হাতে যে কি নগদ পাচ্ছি, তা ত কিছু বুঝ্‌ছি না, আর যে সব কথা শুন্‌ছি, তাও যে কত দূর বুঝ্‌ছি, তাও জানি না।

এখন একটা জিজ্ঞাসা করি, সেই—জীবন্মুক্তির কথায় বল্লেন, আমিটা ম'রে যায় কিম্বা যদিই একটুকু থাকে, সে মরা-আমি হ'য়ে থাকে—ঐ কথাটা কি বলুন দেখি ?

ভ। এ কথাটা মনের কথার চেয়েও শক্ত, ঠাকুরের কৃপায় যতটুকু দেখ্‌ছি, বলি শুন'।

ছেলে বেলা থেকে মানুষ যে এই "আমি" "আমি" রবটী ধরে, এটা বড় সর্ব্বনেশে রব। জুজু ব'লে ভয় দেখালে ছেলেরা যেমন ভয় পায়, অথচ জুজু ব'লে একটা কোন জিনিস নাই ; তেমনি "আমি" "আমি" ব'লে মানুষ যে চীৎকার ক'রে বেড়ায়, কিন্তু আমি ব'লে কোন একটা জিনিসই নাই। ছেলে বড় হ'লে যেমন বুঝ্‌তে পারে যে, জুজু একটা ভয়-বাচক শব্দ মাত্র, তেমনি মানুষের জ্ঞান হ'লে সে বুঝ্‌তে পারে, আমি একটা অহঙ্কার-বাচক শব্দমাত্র—জুজুর মত অলীক, মিথ্যা।

পরমহংসদেব ব'ল্‌তেন, আমিটা কেমন জান',—যেমন পিঁয়াজটা। পিঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যেমন পিঁয়াজে আর পিঁয়াজ থাকে না ; তেমনি শরীরটা ধ'রে বিচার কর্‌তে গেলে, আমিকে আর পাওয়া যায় না।

মানুষে যে এত বিশ-বাঁউ জলে প'ড়েছে, মানুষে যে সিদে পথ ছেড়ে গোলকধাঁধার ভিতর ঢুকেছে, মানুষে যে এমন শুষ্ক ডাঙ্গায় বাস ক'রে অকূল জলে ভাস্‌ছে, এর মূল কারণ এই—নাই-আমিকে আছি-আমি জ্ঞান করা। আমি-জ্ঞানটি যে

পূরো অজ্ঞান ও অবিদ্যার বন্ধন, এই জ্ঞানটী হ'লেই তার ধোঁকার টাটী ভেঙ্গে যায়; তার ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্যের ধাঁধা ছুটে যায়; তার শুচি অশুচি সমান হয়; তার গলার হার গলায় রয়েছে, সে দেখ্‌তে পায়; তার পূজা জপ ক্রিয়াকাণ্ড সব ঘুচে যায়; তার বিশ্বময় হরিদর্শন হয়; আর যা কিছু হয়, তা সেই অবস্থায় না পড়্‌লে, কেউ বুঝ্‌তে পারে না।

আমি অমুকের ছেলে, আমি অমুক, আমাকে জানিস্ না—এই সব কথাগুলি যে আমি বলে, সে আমিটী মিথ্যা নয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ সে আমি কে জান'? সে আমি—তিনি মাত্র। এক বিষয়টী বিচার-বুদ্ধিতে স্থির করা যায় না, হাজার বার শুন্‌লেও বুঝা যায় না; তবে যখন ভগবান্ বুঝিয়ে দেন, দেখিয়ে দেন, তখন মানুষ বুঝ্‌তে পারে ও আমি-হারা হয়। সৃষ্টিতে একটা বই দুটী জিনিষ নাই। এই জীব-জগতে যা কিছু দেখ্‌ছ', সব সেই তিনি। মায়ার কৌশলে, বন্ধনে জীব "আমি" "আমি" করে। মায়ার এমন মোহিনী খেলা, এই আমিটি যে তিনি, এ ব্যাপারটা আর জান্‌তেই দেয় না। এই মায়ার খেলায় জীব মুগ্ধ। মায়া, জীবকে তাঁর খেলা প্রাণান্তেও দেখ্‌তে দেন না! এই মায়া দ্বিবিধ ভাবে খেলা ক'চ্ছেন। এক বিদ্যা-মায়া আর এক অবিদ্যা-মায়া। যে সব জীব অবিদ্যা মায়ার রাজ্যগত, তারা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে, গুরুহারা হ'য়ে বেহুঁশ হয়ে খেল্‌ছে। ইহারা মায়ার কিছুই খেলা দেখ্‌তে পায় না। ইহাদের দিনে-রেতে এক ধারা বইছে। আর যারা ভগবানের কৃপায় বিদ্যা-মায়ার অন্তর্গত, তাদিগে মায়া নিজের খেলা দেখিয়ে দিয়ে খেলাতে খেলাতে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।

এমন জীব, কোটির মধ্যে একটাও দুর্লভ। এ একটী যদি মিলে, সে মায়ের বরপুত্র। এইটী জেনো, ইনি বরপুত্র হ'লেও হাসি কান্নার খেলা থেকে মুক্ত নন্। যতদূর খেলা, ততদূর মায়ার রাজ্য। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর থেকে কীটাণুকীট পর্য্যন্ত মায়ার ঘুর্ণিপাকে সব ঘুর্‌ছেন। মায়ার বন্ধন কেমন জান'—আভাসে যেমন রবারের গোলাকার দড়ি। যে বস্তুটাকে বাঁধে, সেটা যতই মোটা হোক না কেন, দড়ির আয়তন ততই বৃদ্ধি হয়; আবার সেটা যতই সরু সূক্ষ্ম হোক না কেন, দড়ির আয়-তন ততই সরু ও সূক্ষ্ম হয়। বস্তু যতই সূক্ষ্ম হোক, বন্ধনের মধ্যে থাক্‌তে হবে। এই বন্ধনের পর যে কি, তা আমি জানি না ও তার কিছুমাত্র আভাসও জানি না। যিনি যতই বরপুত্র হোন্ না কেন, বাঁধনের হাতে মুক্তি নাই। তবে বরপুত্রের বাঁধন প্রার্থনীয় ও দেবেশবাঞ্ছিত। কেন না, এ বাঁধনে সুখ বই দুঃখ নাই। এঁরা মায়ার খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যান। এখা-নেও অবিদ্যার বন্ধনের মত মনের হাসি কান্না আছে বটে, কিন্তু এ হাসি কান্না আর এক রকমের। ইহাতে বেহুঁশ করে না, আর একটা মজা আছে। এই সব মায়ার খেলা; মায়ার কৃপায় এ খেলা দেখ্‌বার জিনিস—শুন্‌বারও নয় আর বল্‌বারও নয়।

"আমি"র কথা হচ্ছিল; মায়া এই আমিটিকে আর দেখ্‌তে দেয় না, আর "আমি"ও একেবারে যায় না। রামকৃষ্ণজী জীবকে এই সব খবর জানিয়ে দিবার জন্য, অনেক সাধনা করে-ছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে বোল্‌তেন, নাহং, নাহং, তুঁহু, অর্থাৎ আমি নই, আমি নই,—তুমি—তুমি। জীব আমি ছেঁড়ে,

তুমি তুমি কখন্ বলে, রামকৃষ্ণজীর কথিত তার একটি উপমা বলি শুন'।

গরু পশু জাতি। বাছুরটি প্রসব হবা মাত্র হাম্বা হাম্বা রব ধরে। হাম্বা হাম্বা মানে—হাম্হে হাম্হে, অর্থাৎ "আমি" "আমি"। বড় হ'লে, চাষা লাঙ্গলে বা গাড়ীতে যুতে দিনে-রেতে খাটায়, তবু আমি রবটী ছাড়ে না। বুড়ো হ'লো, অস্থিচর্ম্ম-সার হ'লো, খাটুনির বিরাম নাই, তবু রবটী ছাড়ে না। তার পর ম'রে গেল; চামড়াটা নিয়ে চেঁছে ছুলে, পিটিয়ে, টেনে ঢাক ছাইলে; সেই চামড়া ঐ অবস্থাতেও বাজালে হাম্ হাম্ করে রবটী আর ছাড়ে না। সব শেষে শিরা, আঁত ইত্যাদি নিয়ে তায় ক্রমাগত পাক দিয়ে দিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। তখন সে অবস্থাতেও তার ভিতরে আমি থাকে। তার পর ধুনুরী যখন তার যন্ত্রে তাঁত সংযোগ ক'রে টান দিয়ে বাজায়, তখনও ক্ষীণ স্বরে "আমি" "আমি" রব করে। সকলের শেষে যখন জানু পেতে ব'সে, যন্ত্রটী ধ'রে, ডান হাতে মুগুর নিয়ে বার্ বার্ সেই তাঁতের উপর প্রবল বেগে ঘা মারে, তখন সে, সেই চিরকেলে "আমি" রবটী ছাড়ে আর তুঁহুঁ তুঁহুঁ করে। জীবকে এই রকমে খাটিয়ে, বাইয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়ে, উদ্‌ব্যস্ত ক'রে ধন, জন, মান ছাড়িয়ে নিয়ে, ক্রমাগত শোকে তাপে যদি জর্জ্জরিত করা হয়,তখন সে আর "আমি" "আমি" করে না—বলে হে ভগবান্, "তুমি" "তুমি"। জীবের এই রকম দুর্দ্দশাগ্রস্থ না হোলে, ঐ যে বজ্জাত আমি তার ভিতর ঢুকেছে, সে আমি আর যায় না। এই আমি স্বয়ং মূর্ত্তিমতী মায়া।

পাঁ। আপনি পূর্ব্বে ব'ল্লেন যে, আমি নামে যে জিনিষটী,

সেটী আমি নয়, সেটী তিনি। আবার এই আমিটীকেই বজ্জাত আমি ব'ল্‌ছেন, তা'হলে তিনি, বজ্জাত হলেন কি ক'রে?

ভ। মায়ার ভয়ঙ্কর খেলা, যতদিন না ঈশ্বর-লাভ হয়, তত-দিন পাপপুণ্য, ভালমন্দ, সৎ-অসৎ, এই সব দ্বন্দ্বভাব থাকে। আর ঈশ্বর লাভ হ'লে, মন্দ কি বজ্জাত বল্‌বার কিছু থাকে না। বজ্জাত আমি কতদিন থাকে জান'? যত দিন ঐ "আমি" কে না দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাকে দেখ্‌তে পেলে আর বজ্জাত থাকে না। বজ্জাত অবস্থায়, "আমি" অহংকারে পরিপূর্ণ থাকে। এই অহংকার—মায়া। এই অহংকার নষ্ট হ'লেই ঐ আমিটী "তুমি" হয়। আমি যখন "তুমি" হয়, তখন তার আর মায়া-অহংকার থাকে না। আমি কে চিন্‌তে পার্‌লে অহংকার এমন পালায় যে, আর তাকে ত্রিভুবন খুঁজ্‌লেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। রাম-কৃষ্ণজী মধ্যে মধ্যে ব'ল্‌তেন, দেখ' আমিটীকে খুঁজ্‌তে গেলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলাম না। সেই অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্‌ ভগবান্‌ এক হয়েও, মায়াকে সঙ্গে নিয়ে জীব-জগৎ সৃষ্টি ক'রে অগণ্য কোটি 'আমি' হ'য়ে খেলা কর্‌ছেন। তিনি একটী মাত্র বস্তু, অনন্ত ঘটের ভিতর প্রবেশ ক'রে অনন্ত "আমি" হ'য়ে রয়ে-ছেন। প্রত্যেক ঘটের প্রত্যেক অবস্থাতে সেই তিনি বই আর কেউ নয়। এই জ্ঞান হ'লে আমি অর্থাৎ বজ্জাৎ আমি আর থাকে না; যা থাকে, তা তিনি।

জ্ঞানমার্গীরা "আমি"কে যখন চিন্‌তে পারেন, তখন তাঁরা সোঽহং বলেন, আর ভক্তেরা "তুমি" বা "তিনি" বলেন। ঠাকুর রাম-কৃষ্ণজী ভিতরে পূর্ণজ্ঞানী, কিন্তু জীব-শিক্ষার জন্য তিনি ভক্তি-ভাব দেখাতেন। ঠাকুরের মূর্ত্তিটী যেন জ্ঞানময়, আর সেই

মূর্ত্তিটী ভক্তির চাদরে ঢাকা। ঠাকুর জানেন যে, এই কলিকালে জ্ঞান-পথে যাওয়া বড় শক্ত, আর ভক্তিপথে সহজ; তাই সর্ব্বদা তাঁর ভক্তির চাদরখানি গায়ে থাক্‌ত; অর্থাৎ ঈশ্বর-লাভে ভক্তি-পথে যাবার জন্য তিনি সকলকেই উপদেশ দিয়েছেন।

আমি-দর্শনের নাম আত্মদর্শন। আত্মদর্শন হ'লেই বজ্জাৎ "আমি" পালিয়ে যায়; সে আর থাকে না। পূর্ণজ্ঞান হলেই আত্মদর্শন হয়, বা আত্মদর্শনে পূর্ণজ্ঞান হয়। পূর্ণ-জ্ঞানে আমিটা কিরূপ থাকে না, জান'—যেমন, যতক্ষণ না ঠিক দুফর বেলা হয় অর্থাৎ সূর্য্যটী ঠিক মাথার উপরে না উঠে, ততক্ষণ বস্তুর একটা ছায়া থাকে; আর সূর্য্যটী মাথার উপর উঠ্‌লেই চার-দিকে তাকাইলে ঐ ছায়াটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না; ঠিক তেমনি জ্ঞানসূর্য্য পূর্ণভাবে বিকাশ হবামাত্র ঐ বজ্জাৎ আমিটীকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তখন বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় যে,এত দিন ছায়ার মতন ঐ বজ্জাৎ আমি ছিল। ছায়া মাত্রেই ছায়া হয়েও অলীক; সুতরাং আমিটাও তদ্রূপ অলীক। অজ্ঞানে আমিটী ছায়াভাবে থাকে; পূর্ণজ্ঞানে ছায়াটী অর্থাৎ বজ্জাৎ আমিটী চ'লে যায়। তবে থাকেন কে? ছায়াটী যাঁকে ধরেছিল, তিনিই কেবল থাকেন। এই দর্শন অনবরত থাকে না; সংসারের কাজে নাম্‌লেই আবার আমি এসে পড়ে। তবে এখন আর তার কেরামত থাকে না।

এই আত্মদর্শন হলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেই এক ভগবান্ লীলায় সৃষ্টিতে অনন্ত হ'য়ে রয়েছেন। এই দর্শনের নাম বিরাট-রূপদর্শন। তুমি স্মরণ কর, বহু পূর্ব্বে বলেছি, রামকৃষ্ণজীর বিরাটরূপ আছে—এই তাঁর বিরাটরূপ। "যে রামকৃষ্ণ-

জীকে চোদ্দপুয়া দেখেছি, সেই তাঁকেই এখন পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তুতে দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই জগৎ রামকৃষ্ণময়। রামকৃষ্ণজী চোদ্দপুয়াও বটেন, আবার এই বিরাটরূপীও বটেন। পৌত্তলিক-ধর্ম্মে যাঁরা যাঁরা দোষারোপ করেন, পৌত্তলিকতাকে যাঁরা ভ্রান্ত ব'লে ব্যাখ্যা করেন, এই আত্মদর্শন হলেই তাঁদের অজ্ঞানতা বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম কেশব সেন, ঠাকুরের মা-কালীর উপর ভক্তি বিশ্বাস দে'খে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মহাশয়, আপনার মা-কালী কত বড়? ঠাকুর উত্তর দেন—কেশব তুমি বিলাত গিয়াছিলে; সাগর দেখেছ' ত? আমার মা-কালী তাঁর চেয়েও বড়। আর একবার কেশব বাবু সশিষ্যে ঠাকুরের সঙ্গে কোন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন পথের পার্শ্বস্থিত একটা গাছের ডাল ছেদন কচ্ছিল, ঠাকুর তাই দে'খে অসহ্য আর্ত্তনাদে ডাক ছেড়ে এই ব'লে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, "ওগো, আমার মাকে কাট্‌ছে"। কেশবকে ইহাতে দেখালেন যে, মা-কালী সৃষ্টিময়ী, ব্রহ্মময়ী; শুধুই যে চোদ্দপোয়া, তা নয়। আবার এদিকে মা-কালী চোদ্দপুয়ারূপে কত ঠিক, তার কতই যে দেখালেন, তার সীমা নাই। মা-কালীর নাকের কাছে তুলা ধ'রেও দেখেছেন ও দেখিয়েছেন যে, মা-কালীর নিশ্বাস পড়্‌ছে। এক দিনের ঘটনা শুন'—ঠাকুর আপনার ছোট খাটে ব'সে আছেন, অনেক ভক্তও কাছে আছেন; ঠাকুর হঠাৎ পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে একবারে উঠানে হাজির; যেখান থেকে মা-কালীর গোটা মন্দিরটী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ঠাকুর মহাভয়ে ব্যাকুল প্রাণে মন্দিরের নবরত্নের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি ক'রে ও হাত তুলে চীৎকার ক'রে বোল্‌তে লাগ্‌লেন "দেখিস্ মা" প'ড়ে যাবি,

প'ড়ে যাবি"। এই ব'লেই প্রায় বাহ্যশূন্য। ভক্তেরা ধরাধরি ক'রে তাঁর ঘরে তাঁকে নিয়ে এলেন ; কতক্ষণ পরে ঠাকুরকে কারণ জিজ্ঞাসায়, উত্তর দিলেন—মা মাতালের মতন টোল্‌তে টোল্‌তে নবরত্নের কার্ণিশের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, পাছে প'ড়ে যায়, তাই ভয়ে আমি এমন হয়ে গিয়েছিলুম।

রামকৃষ্ণজীর মহল্লীলা শুনে বুঝ', সাকারবাদীরা কত রকম রসাস্বাদ করেন। তাঁরা মাকে চোদ্দপুয়াও দেখেন, আবার বিশ্বময়ী, ব্রহ্মময়ীও দেখেন। একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—ব্রাহ্মধর্ম্মে ও হিন্দু-ধর্ম্মে প্রভেদ কি ? ঠাকুর উত্তর করেন—শানাই বাজানো দেখেছ' ? যেখানে শানাই বাজে, সেখানে দুজনা শানাইওয়ালা থাকে। একজন কেবলমাত্র পোঁ ধ'রে থাকে, আর একজন রাগরাগিণী বাজায়। ব্রাহ্মরা পোঁ ধ'রে থাকে আর সাকারবাদীরা রাগরাগিণী বাজায়।

রাগরাগিণী বাজায় এর মানে,সাকারবাদিরা ভগবান্‌কে নানা রূপে সরাটে, বিরাটে, সাকারে, নিরাকারে,সকল রকমে সম্ভোগ করেন। রামকৃষ্ণজী অগণ্য সাধনা ক'রে ও ভগবান্‌কে সকল রকমে সম্ভোগ ক'রে জগৎকে এই ব'লে গেলেন—ভগবানে সব সম্ভব। তিনি সব হ'তে পারেন ও হন। আর একটী কথা, বার বার বল্লেন যে—ভগবান্‌কে কেউ সীমাবদ্ধ ক'রবে না। তিনি এইটী—আর অন্যটী নন্ বা হ'তে পারেন না ; এই কথাটী জোর করে বল্‌বে না। ভগবানের সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ কর্‌লেই সেই অসীমকে সীমাবদ্ধ করা হয় ; তাঁর সর্ব্ব-শক্তিমানত্বে হস্তক্ষেপ করা হয়।

এখনকার ব্যবসাদার ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মধ্যে এই মন্তব্য বড়ই

প্রবল। তাঁরা বলেন, এই আমাদের মতটী বা আমরা যা বল্‌ছি, এইটীই সত্য, আর অপরে যা করে বা বলে তা ভ্রান্ত। এ প্রকার বুদ্ধিযুক্ত অজ্ঞান ব্যবসাদারদিগে নমস্কার।

আমিটি ম'রে গেলেই মানুষ মুক্ত হয়। ভগবান্ রামকৃষ্ণ-জীর কথা—"মুক্ত হব কবে, আমি যাবে যবে"। বদ্ধ, মুক্ত এই দুটি অবস্থা কে জানিয়ে দেয় জান'? মন। মন যদি তোমাকে বুঝিয়ে দেয় তুমি বদ্ধ, তা হোলে তুমি বদ্ধ; আর মন যখন মুক্ত ব'লে জানিয়ে দেয়, তখন তুমি মুক্ত। সব মনের খেলা। মনই ইহার ইন্দ্রিয়স্বরূপ। মন যতদিন বদ্ধ থাকে, ততদিন মন সর্ব্বদাই সংশয়যুক্ত। এ অবস্থায় মনের নাম সংশয়, আর মুক্তাবস্থায় মনের নাম চৈতন্য। মন, বুদ্ধি দুটী বস্তু, কিন্তু শুদ্ধাবস্থায় একটি হয়, আর তখন তার নাম হয় চৈতন্য। ভগবান্ মন বুদ্ধির অগোচর হ'য়েও মন-বুদ্ধির গোচর, ইহার অর্থ—তিনি মনের সংশয়যুক্ত অবস্থার অগোচর, আর শুদ্ধ-মন, শুদ্ধ-বুদ্ধির বা চৈতন্যাবস্থার গোচর। শুদ্ধমন শুদ্ধবুদ্ধি বা চৈতন্যের সহায়েই যে চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময়, সেই চৈতন্যময়ের সাক্ষাৎকার হয় এবং এই অবস্থাতে মন-বুদ্ধি (খণ্ড চৈতন্য) চৈতন্যময়ের সঙ্গে মিশেও যেতে পারে। একটি গানের কতটুকু বলি শুন'। এই গান ঠাকুর অনেক সময়ে গাইতেন।

মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামা-পদ নীলকমলে। * *
ভ্রমর কালো, চরণ কালো, কালোয় কালো মিশে গেল ইত্যাদি।

মন যখন শ্যামা-পদ নীল-কমলে মজে, তখন সেই মন চৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তখন তার আর মন নাম

নাই, তখন তার নাম শুদ্ধ মন বা চৈতন্য ; এখন তার পূর্ব্বকার বর্ণ ফিরে গিয়ে শ্যামার পায়ের যে বর্ণ, সেই বর্ণ হ'য়ে গেছে। আবার এ দিকে মা চৈতন্যময়ী, সেই চৈতন্যময়ীর সঙ্গে মন-চৈতন্য সমজাতি হওয়া বশতঃ কালোয় কালো মিশে গেল, এবং এই মিলনে সব গোল মিটে গেল, সংসারের খেলা ফুরালো ও তত্ত্বে তত্ত্ব এক ঠাঁই হ'ল'।

মন শুদ্ধ হ'য়ে একবার চৈতন্য হ'লে অমনি চৈতন্যময় তাকে ধ'রে ফেলেন। ইহার অর্থ, মন চৈতন্য হ'লে, সে চৈতন্যময়ের সমজাতি হয় কি না? সমজাতি হ'লেই মিলন অবশ্যম্ভাবী। সমজাতি না হোলে কেউ কার সঙ্গে মিলে না। দুধের সঙ্গে দুধ মিশে, কিন্তু ঘি যদিও ঐ দুধেই প্রস্তুত, তথাপি দুধে ঘিয়ে মিশে না। দুধে ঘি দিলেই, ঘিটা আলাদা ভাস্‌বে। কিন্তু যদি ঐ দুধকে ঘি করা যায়, তা হোলে উভয়ের উভয়ত্ব নষ্ট হ'য়ে একত্ব হবে অর্থাৎ মিশে যাবে। চৈতন্যময়ে মায়া মিশ্রিত হ'য়ে এই সৃষ্টি জীব-জগৎ হ'য়েছে। এই জীব-জগৎ মায়া-বিমুক্ত হ'লেই চৈতন্য হ'য়ে যাবে। এ অবস্থায় সেই বহুরূপী একরূপী হন এবং তা কি প্রকার— কেবল তাঁর গোচর মাত্র।

এই ধ'রে বুঝ', সেই চৈতন্যময় মায়া উপাধি গ্রহণ ক'রে, কেমন জীব-জগৎ হয়েছেন এবং জীব-জগতে যাবতীয় অনন্ত কোটি সেই তিনি বই আর কে? এই দুনিয়া সেই একের খেলা কি প্রকার দেখ'। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, আত্মা, জীবাত্মা এই সব যাবতীয় নাম সেই এক বস্তুর মাত্র।

প্রা। আত্মা, জীবাত্মার কথা নূতন হ'লো। এ দুটি কি রকম?

ভ। আত্মা, জীবাত্মা এই দুই ধ'রেই যাবৎ খেলা। আত্মাকে আত্মাও বলে, আবার পরমাত্মাও বলে। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা ও ভক্তের ভগবান্ এই তিনটি এক জিনিষ ও একের নাম; বৃহদগ্নি থেকে যেমন গণনাতীত অগ্নিকণা বা ফিনকির সৃষ্টি, তেমনি আত্মা বা পরমাত্মা থেকে জীবাত্মাদের সৃষ্টি। এক পরমাত্মা নিজের মহাশক্তি মায়ার সহায়ে কোটি কোটি নানাজাতির, আকৃতির, গুণের ও বর্ণের জীবাত্মারূপে পরিণত বা তাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা। জীবাত্মারা পরমাত্মাতেই বিচরণ কচ্ছে, তা'তেই সৃষ্ট এবং তাতেই লয় হয়। পরমাত্মার মধ্যে জীবাত্মা কেমন, উপমা দিয়ে বলি শুন'—পরমাত্মা যেমন অকূল, অপার মহাসাগর। এ সাগরের আদি অন্ত কিছুই নাই। এই সাগরে জীবাত্মারা কি ভাবে অবস্থিত জান',—যেমন কোটি কোটি রকমের কোটি কোটি পাত্র এই সাগরের জলে নিমগ্ন। এই এক একটি জলপূর্ণ পাত্র এক একটি জীবাত্মা।

জীবাত্মাদের মধ্যে যে কোটি কোটি রকমের শরীর, রূপ, আধারপাত্র, তাও ঐ জল থেকে হ'য়েছে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, সূক্ষ্মই স্থূল হ'য়েছেন—যেমন বাষ্প অতি সূক্ষ্ম, ঐ বাষ্প থেকে মেঘ হ'য়েছে, মেঘ থেকে জলকণা, জলকণা থেকে জলবিন্দু, জল-বিন্দু থেকে জল, আবার জল থেকে বরফ, তেমনি অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মা স্থূল হ'য়ে আধার হ'য়েছেন, আর ঐ আধারের ভিতরে সেই জলরূপ পরমাত্মাই আছেন। জীবাত্মার জন্মও নাই, আর মরণও নাই। জল থেকে হয়, জলে থাকে আবার জলেই মিশায়। ঘটের ভিতর জল-

রূপ যে জীবাত্মা, সেও যেমন ঘট ভাঙ্গলে জলে মিশায়, তেমনি ঘটটীও স্থূল থেকে সূক্ষ্ম হ'য়ে সেই জলে মিশায়। মরণ কাকে বলে জান'?—ঐ যে ঘট ভেঙ্গে ঘটের জল সাগরে মিশিয়া যায়, কি আর এক ঘটে প্রবেশ করে, ওর নাম মরণ। সূক্ষ্ম যেমন স্থূল হয়, স্থূলও তেমনি সূক্ষ্ম হয়—যেমন বরফ গ'লে জল, জল থেকে মেঘ বাষ্প ইত্যাদি।

এই যে পরমাত্মাকে সাগরবৎ বল্লাম, তাও বলা যায়, আবার মহাকাশও বলা যায়। বেদে শুনেছি মহাকাশ বলে।

"বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
শূন্যেতে পাপ পুণ্য মান্য গণ্য ক'রে সব খুয়ালে॥"

বাষ্পের যেমন স্থূলাবস্থা মেঘ, জলকণা, জল, বরফ, তেমনি মহাকাশের স্থূলাবস্থা পঞ্চভূত। আবার এই পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হ'য়ে জীব-জগৎ। সূক্ষ্ম থেকে স্থূল, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম যেমন, তেমনি নিত্য থেকে লীলা ও লীলা থেকে নিত্য। এ দিক ধ'রে ওদিক যাওয়া যায়, আবার ওদিক থেকে এ-দিকে আসা যায়। একেই পরমহংসদেব অনুলোম-বিলোম ব'ল্তেন। তিনি আরও একটি বড় সুন্দর কথা বোল্তেন —যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা—যাঁর লীলা, তাঁরই নিত্য। এই জন্য ঠাকুর শঙ্করের মত, জীবজগৎ মিথ্যা—এ কথা বলেন নাই। তবে শঙ্করের মতকেও উড়িয়ে দেন নাই।

জীবাত্মা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণজী যেমন বুঝাচ্ছেন, দেখাচ্ছেন, আর এক রকমে তোমায় বলি শুন। জীবাত্মা আর কেহ নয়, সেই পরমাত্মাই জীবাত্মা—তফাতের মধ্যে, পরমাত্মায়

মায়া নাই, জীবাত্মায় মায়া আছে। পরমাত্মাই মায়া উপাধি নিয়ে জীবাত্মা হ'য়েছেন। পরমাত্মায় মায়া থেকেও নাই—তাঁর মায়া তাঁর কাছে মায়া নয়। মায়াতে তাঁকে ভুলাতে পারে না। মায়া তাঁকে লাগে না; যেমন সাপের কয়েসে বিষ আছে, কিন্তু সে বিষে সাপের কোন অপকার হয় না, তেমনি পরমাত্মায় মায়া থেকেও তাঁকে অভিভূত ক'রতে পারে না—জীবাত্মাকে মুগ্ধ করে। পরমাত্মার নির্লিপ্ত ভাব, জীবাত্মার লিপ্তভাব। পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ, আর জীবাত্মা ফলভোগী। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, জীবাত্মা সব ভোগ করেন, পরমাত্মার কাছে এরা যেতে পারে না—সে কেমন জান',—যেমন ধূঁয়া—ধূঁয়া যদি দেয়ালের গায়ে লাগে, তা হ'লে দেয়ালে দাগ পড়ে, কিন্তু আকাশে কোন কলঙ্ক বসাতে পারে না। যিনি মায়ামুক্ত পরমাত্মা কি শিব, তিনিই মায়াযুক্ত জীবাত্মা কি জীব। এই জীবাত্মা, মায়াটী ছেড়ে দিলেই স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শিবত্বে গত হয়। জীব শিব হ'য়ে জন্ম-মরণের ভয় থেকে এড়ান।

পা। পরমাত্মা স্বাক্ষীস্বরূপ আর জীবাত্মা ফলভোগী, এই ব্যাপারটী কি রকম?

ভ। ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর শ্রীমুখে এ বিষয় যেমন শুনা আছে, তাই বলি, শুন'। একদিন ঠাকুর বল্লেন যে, আমার সাধন-ভজনের সময় এক দিন আমি পঞ্চবটীর তলায় ব'সে আছি, হঠাৎ গাছের দিকে লক্ষ্য পড়ে। দেখ্‌লাম গাছের একটী ডালে দুটী পাখী র'য়েছে; একটী পাখী স্থির, ধীর, নড়ে চড়ে না; যেমন সোনার পাখী, আর একটী ঠিক তার বিপরীত

প্রকৃতিযুক্ত; একবার পড়্‌ছে, একবার লাফাচ্ছে, একবার খেল্‌ছে, একবার শব্দ ক'র্‌ছে। খানিকক্ষণ পরে, যে পাখীটী স্থিরভাবে আছে, সে মুখ হাঁ ক'র্‌লে, আর অপর চঞ্চল পাখীটী তার মুখের ভিতর ঢুকে গেল। যেমন মুখের ভিতর গেল, অমনি সেই অচঞ্চল পাখী মুখ মুদে দিলে। ঠাকুর সেইটী দে'খে বুঝ্‌লেন যে, পরমাত্মার স্থির ভাব, সাক্ষীস্বরূপ অবস্থিত, আর জীবাত্মা হাসে, নাচে, কাঁদে, সুখ-দুঃখের ফল ভোগ করে, কিন্তু সময়ে পরমাত্মায় লয় হ'তে পারে।

পা। যখন পরমাত্মাই জীবাত্মা হ'য়েছেন, তখন উভয়ের পার্থ্যকের কারণ কি? আবার জীবাত্মার লয়ই বা কি প্রকার?

ভ। তোমাকে এই কিছু পূর্ব্বে বলেছি, সেই এক অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিকার, নিরাকার, মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির অগোচর, নামহীন, সর্ব্বপ্রবিষ্ট, জীব-জগতাদি সৃষ্টির নিদান পরমাত্মা, নিজের মায়াশক্তি-প্রভাবে এক হ'য়েও লীলাতে বহুধা আকারে বর্ণে, গুণে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে পরিণত হয়েছেন। মায়া শক্তিসম্ভূত এক একটী উপাধি নিয়ে, তিনি এক এক অবস্থাগত; দৃষ্টান্তে যেমন গিরিশবাবু—তাঁর নাম গিরিশ, জাতিতে কুলীন কায়স্থ, নাট্যকার, পণ্ডিত, কবিচূড়ামণি, রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাপক, শিক্ষক ইত্যাদি। এই এক একটী তাঁর উপাধি। বস্তুতঃ তিনি উপাধিহীন, কিন্তু এই উপাধিগুলির বন্ধনে, তিনি জীবাত্মা হ'য়ে রয়েছেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি নিজের স্বরূপ অবগত হ'য়ে এই উপাধিগুলি অর্থাৎ বন্ধনগুলি পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরমাত্মায় লয় হবেন। তোমরা বড় মাঠ দেখেছ'? এক এক মাঠের মধ্যে হাজার হাজার কাঁদি আছে। কাঁদিগুলি

আর কিছুই নহে, কেবল সেই বিস্তৃত মাঠেরই অন্তর্গত খণ্ডাংশ।

খণ্ডাংশগুলি চারিদিকে আইল দ্বারা পরিবেষ্টিত বা বন্ধনযুক্ত বশতঃ কাঁদি নামে প্রচলিত। যদি সেই আইল বা বন্ধনগুলি তুলে দিয়ে কাঁদিগুলিকে মুক্ত কর, তা হ'লে সেই মাঠ যাহা আইলবন্ধন দ্বারা শত শত খণ্ড হয়েছিল, এখন এক প্রকাণ্ড বিস্তৃত ভূমিতে পরিণত হবে। এইরূপ জীবাত্মা উপাধি হ'তে বিমুক্ত হ'লেই সেই অসীম অনন্ত পরমাত্মাতে গত হবে। জীবাত্মার উপাধিত্যাগে এই অবস্থাগত হওয়ার নাম লয়।

পা। আপনার মতে তবে পরমাত্মা নিরাকার ও মনোবুদ্ধির অগোচর?

ভ। নিরাকারও বটেন, সাকারও বটেন। আকাশ, বাতাস নিরাকার হ'য়েও যেমন একরকম সাকার, তেমনি পরমাত্মা নিরাকার হয়েও একরকম সাকার; অর্থাৎ যে যে আধারে আছেন, সেই সেই আধারের আকারে পরমাত্মার আকার। মানুষের আধারে মানুষের আকার; গাভীর আধারে গাভীর আকার; গাছের আধারে গাছের আকার। জলের ত কোন আকার নাই, কিন্তু যদি থালায় জল রাখ, তা হ'লে জল থালার মত গোল; কলসীতে রাখ, কলসীর মত; জালায় রাখ, জালার মত; এখানেও এই ব্যাপার।

মনোবুদ্ধির অগোচর হ'য়েও মনোবুদ্ধির গোচর। মনোবুদ্ধি যেখানে অশুদ্ধ, সেখানে অগোচর এদিকে শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধির গোচর। এই রকম মায়া উপাধি থাকা হেতু তিনি এক অনন্ত হয়েও সান্ত; নির্ব্বিকার হ'য়েও বিকারযুক্ত, নামহীন হ'য়েও নাম-

যুক্ত, অর্থাৎ পরমাত্মা হ'য়েও জীবাত্মা অথচ পার্থক্যভাব। সেই জন্য ভগবান্ বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণজী এই সকল বিষয় আলোচনার সময় হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্‌তেন, তাও বটে, তাও বটে, আবার এ দুই ছাড়া যা কিছু তাও বটে। ঠাকুর এই ভাবটীতে সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত ক'রে দিলেন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় কর্‌লেন; বিশ্বজনীন ধর্ম্মের বনিয়াদ তুল্‌লেন; আবহমানকাল ধর্ম্মে ধর্ম্মে যে একটী বিদ্বেষভাব ছিল, তার মূলোৎপাটন ক'রে রামকৃষ্ণ-অবতারে বিবাদ-বিভঞ্জন নাম ধারণ ক'র্‌লেন। ঠাকুর যা কিছু কর্‌লেন বা বল্‌লেন, তা সব শাস্ত্রীয়, তথাপি তার মধ্যে তাঁর একটী বিশেষ নূতনত্ব আছে। নূতনত্বটী এই, তিনি কিছুই বাদ কি অগ্রাহ্য কর্‌লেন না। তাই জীবশিক্ষায় বল্‌লেন, সব সত্য, সব সত্য। তোমরা বিবাদ কর্‌বে না। যার যে মতে, যে পথে যেতে ইচ্ছা, সরল মনে, ব্যাকুল হ'য়ে সেই মতে সেই পথে চ'লে যাও। কারও দুদিন আগে, কারও দুদিন পরে অবশ্যই ঈশ্বর-লাভ হবে। ঠাকুরের কাছে যাবতীয় ধর্ম্মপন্থী আস্‌তেন। সকলেরই মনোরথ তিনি পূর্ণ কর্‌তেন। যিনি ঠাকুরকে ঈশ্বর-লাভের সহায়-স্বরূপ ধ'রেছেন, তিনিই ঈশ্বরলাভ ক'রেছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব যেন আমার ঠাকুরের ভাণ্ডারের মুড়ি-মুড়কি। চাইলেই এক আঁচল। ভাবাবেশে ব'ল্‌তেন, যদি ধন, পুত্র চাও, তারকনাথে যাও, আর যদি ভগবান্ চাও, এখানে এস।

পা। আপনি ঠাকুরের কাছে কি প্রার্থনা করেন বা তাঁর কাছে কোন্ জিনিষের আকাঙ্ক্ষা করেন?

ভ। আমি এই প্রার্থনা করি, হে ঠাকুর, তোমাতে যেন

ভগবত্ত্ব-ভাব আমার কখন না হয়, আর তোমার সেবাচরণ পরিত্যাগ ক'রে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা বা প্রয়াস কখন যেন মনেও না আসে। এই দুটী প্রার্থনা করি।

পা। ভগবান্, ভগবান্ শুনাই যায় মাত্র। আরও শুনি, লোকে ভগবান্ লাভ করে, তাঁর দর্শন পায়, তাঁর সঙ্গে কথা কয়, তাঁর সঙ্গে খেলা করে, এ সকলও শুন্‌ছি। অন্যত্র কেউ কেউ বলেন—তিনি নিরাকার, মনোবুদ্ধির অগোচর; আবার যোগীরা বলেন—যোগের দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায়। যদি তাও বটে, তাও বটে, তবে ভগবান্ জিনিষটী কেমন?

ভা। তোমার প্রশ্নই তোমার উত্তর; তুমি তাঁকে যা ব'ল্‌বে, যা ভাব্‌বে, তিনি ঠিক সেই রকমের। আমি ঠাকুরের কাছে শুনেছি, একজন খুব অনুরাগী, গুরুর কাছে সাধন-ভজন কি ক'রে ক'র্‌বেন, তার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। গুরু বলেন—কোন্ জিনিষটী তোমার খুব প্রিয় অর্থাৎ কাকে তুমি খুব ভাল-বাস? শিষ্য উত্তর করেন—আমি এই কাল মহিষটীকে ভাল-বাসি। গুরু সেই কথা শুনে, শিষ্যকে আদেশ করেন, তুমি ঐ মহিষটীর ধ্যান ক'রো। গুরু-ভক্ত শিষ্য তাই করাতে, তিনি ভগবান্‌কে মহিষরূপে লাভ করেন। এ দিকে মুনি, ঋষি, তপস্বী, যোগীরা যুগ-যুগান্তর তপস্যায়, সাধন-ভজনে, ধ্যানে রত। তাঁরা ধ্যানবলে তপস্যাবলে তাঁকে এমন প্রকাণ্ড দেখ্‌ছেন, যে, তাঁর মহত্ত্বের কি বৃহত্ত্বের এক তিলও সীমা কর্‌তে পারেন না। যিনি এক স্থানে অসীম অনন্ত, তিনিই আর এক স্থানে সাকার-রূপে। বরাহ-বামন ইত্যাদি অবতারদের কথা শুনেছ' ত? কৃষ্ণাবতারে যশোদার গোপাল, রাখালের সখা। রামরূপে

বিমাতার ষড়্‌যন্ত্রে বনে গমন। যিনি জীবের হৃৎপদ্মে বিন্দুভাবে অবস্থিত, তিনিই সৃষ্টির অধীশ্বর এবং তাঁরই এক এক লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যাঁর কাছে পৌঁছুতে পারে না, তিনিই ঐ পাঁচভাবে পরিণত; আবার নিজেই ঐ পাঁচের সম্ভোগকর্ত্তা। যিনি বজ্রের চেয়েও কঠিন, তিনিই আবার প্রস্ফুটিত কমলদলের অপেক্ষাও কোমল। যে যেমন ভাবে তাঁকে দেখে বা চিন্তা করে, তিনি তার কাছে ঠিক তেমনি। এই ধ'রে বুঝ' ভগবান্ কেমন?

পা। যিনি ভগবান্ লাভ করেন, তাঁর অবস্থা কেমন?

ভ। আলু, বেগুন সিদ্ধ হ'লে আলু-বেগুনের যেমন অবস্থা হয়, ভগবান্ লাভ হ'লে মানুষের সেই রকম অবস্থা হয়। ভগবান্ লাভ হ'লে, আর জৈবভাব থাকে না। তাঁর প্রকৃতি অন্য রকমের হ'য়ে যায়। মানুষের লক্ষণ আর তাঁয় থাকে না। মানুষে অর্থাৎ বদ্ধজীবে, তাঁকে দেখ্‌লে পাগল মনে করে। এদিকে দেশ যুড়ে সকলে একরকম, আর অন্যদিকে কেবলমাত্র একটী লোক, তিনি ভিন্ন রকম। দশের সঙ্গে একের না মিল্‌লেই, এক জন পাগল হ'লেন। এ কথা তোমাকে অনেক পূর্ব্বে একবার বলেছি। লোকের ভিতরে অতি অল্পসংখ্যক লোক তাঁকে আদর করেন। এই অল্পসংখ্যকের মধ্যে যাঁরা গণ্য, তাঁরা ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত সাধক। এঁরা ঈশ্বরকে খুঁজ্‌ছেন, এখনও পান নাই। সাধকদের মধ্যে লাখে এক জন ঈশ্বর-লাভ করেন। তাই রামপ্রসাদ একটা গানে ব'লেছেন, "লাখে ঘুঁড়ি একটী কাটে হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।" এই ধ'রে বুঝ' মানুষ কত, আর অমানুষ ক জন!

পা। আত্মার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল, সেই বিষয়টিতেই আমার মন আকৃষ্ট আছে; কাজেই তৎসম্বন্ধে আর দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকা যায় না।

প্রথম জিজ্ঞাস্য, জীবাত্মাই যদি পরমাত্মা বই আর কেউ নয়, তা হ'লে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা কি প্রকারে এত অগণ্য রকমের, প্রকৃতির ও আকারের জীবাত্মারূপে পরিণত হ'লেন?

ভ। তত্ত্বটী যে অতীব গুরুতর, দুর্ব্বোধ্য ও জটিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এটা ভারি ধাঁদার কথা—একবার তোমাকে অনেকটা ব'লেছি, আবার 'বলি শুন'—বৃষ্টির সময় দীঘির জলে গণনাতীত জলবিম্ব হয় দেখেছ'? এখন বিচার্য্য, ঐ বিম্বগুলি কি; কি জিনিসে তৈয়ারি, আর তাদের ভিতরেই বা কি জিনিষ আছে। প্রত্যক্ষ দর্শনের ও বিচারের ফল, যে বিম্বগুলি জলে তৈয়ারি হ'লো, আর তার ভিতরে জলই আছে। ঠিক সেই রকম জান্‌বে, জীবাত্মাগুলি পরমাত্মাতে সৃষ্ট ও তাদের ভিতর সেই পরমাত্মাই আছেন।

এইখানে একটী কথা বেশ বুঝে যেও যে, বিম্বগুলি দীঘির জলে জন্মালো মাত্র, কিন্তু কোন বিম্বটিই সেই দীঘি নয়; সেই রকম এক অদ্বিতীয় মূলাধার পরমাত্মা হ'তে যে এই কোটি কোটি জীবাত্মা হয়েছে, এদের মধ্যে কোন জীবাত্মাই সেই পরমাত্মা নয়, অর্থাৎ দীঘি হ'তে যেমন বিম্বগুলির প্রভেদ, তেমনি পরমাত্মা হ'তে জীবাত্মাদের প্রভেদ। দীঘি কথাটির পরিবর্ত্তে সাগর বলাই উচিত ছিল, কেবলমাত্র তোমাকে প্রত্যক্ষ উপমা দিয়ে বুঝাবার জন্য দীঘি বলেছি। সাগর যেমন সাগররূপে অনাদি অনন্তকাল প'ড়ে আছে, তার

আর কোন পরিবর্ত্তন নাই, তেমনি পরমাত্মা পরমাত্মারূপে আবহমানকাল অপরিবর্ত্তনশীলভাবে স্বস্বরূপে বিরাজমান। সাগরে যেমন তরঙ্গ, বিম্বের জন্ম-স্থিতি-লয় এই ক্রীড়া, পরমাত্মাতেও তেমনি এই পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টির বস্তুর নিত্য ক্রীড়া।

এইখানে জিজ্ঞাসা করতে পার'—সাগরের জলে বৃষ্টির জল পড়ায় যেমন অগণ্য বিম্ব জন্মায়; এখানে যখন এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বই আর কোন বস্তুর সত্তা নাই, তখন পরমাত্মাতে কি দ্রব্য পোড়ে এই পরিবর্ত্তনশীল জীব-জগতের সৃষ্টি হ'লো? এর উত্তর—বৃষ্টির জল আর অপর কিছু নয়, এও সেই সাগরের জল; এতদিন মেঘরূপে শূন্যে ছিল, এখন জল হ'য়ে যার জল তাতেই পড়্‌লো; ফল হোলো তরঙ্গ ও বিম্বের সৃষ্টি, এখানেও ঠিক তাই পরমাত্মা থেকে শক্তি সেই শক্তি পরমাত্মাতেই পোড়্‌লো, ফল হোলো জীব-জগতের সৃষ্টি। সাগরের জলে ও বৃষ্টির জলে যেমন প্রভেদ নাই—উভয়েই জল, তেমনি পরমাত্মাতে ও তাঁর শক্তিতে কোন প্রভেদ নাই, উভয়েই সেই এক বস্তু, তবে স্থানবিশেষে, ভাববিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন মাত্র, যথা;—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, মহামায়া, কালী, কৃষ্ণ, রাম, যীশু, আল্লা ইত্যাদি। এক এক পন্থার লোক এক এক নামে ডাকে। ভক্তে বা সাধকে নামের সময়, কি ভাবের সময় পৃথক্ বটেন, কিন্তু মূলে সকলেই পরস্পরে মিলে যান।

একটী বই আর বস্তু নাই। সেই এক,—লীলাতে বহু হয়েছেন; বহুগুলি সেই একেতেই রয়েছেন, পরে সেই একেতেই লয় হবেন। সৃষ্টির বস্তুগুলি চিরকাল হচ্ছেন, কিছুদিন থাকেন, আবার এক সময়ে অন্তর্ধান হন। সৃষ্টির কোন বস্তুর

ধ্বংস নাই, কেবল তাদের সময়ে সময়ে গুণান্তর, বর্ণান্তর, আকারান্তর ও লোকান্তর হয় মাত্র, এর জন্য সৃষ্টিকে পরিবর্ত্তনশীল বলে।

ভগবানের কৃপায় যাঁরা এই জ্ঞান লাভ ক'রেছেন, তাঁরা জন্ম-মরণের জন্যে উৎফুল্ল বা ত্রস্ত হন না। এই জ্ঞানই ভবসিন্ধুপারের ভেলা; এই জ্ঞানই ত্রিতাপজ্বালার রক্ষা-কবচ; এই জ্ঞানের প্রভাবে মানব মুক্ত-চক্ষু হয় ও সুখ-দুঃখ উভয়েরই পারে গমন করে। এই জ্ঞান লাভ হ'লে জীবের ভববন্ধন-মোচন হয়, আর তার জন্ম হয় না। এই অবস্থাকেই ঠাকুর রামকৃষ্ণজী পোড়া হাঁড়ির অবস্থা বোল্‌তেন। কাঁচা অবস্থায় হাঁড়ি ভাঙ্গলে কুমার আবার তাকে গড়ে, কিন্তু হাঁড়ি পোড়ান হবার পর যদি ভাঙ্গে, তাতে আর গড়ন চলে না; সেই রকম এই জ্ঞানাগ্নিতে জীবকে পুড়িয়ে এমন অবস্থায় উপনীত করায় যে, দেহত্যাগে তার আর জন্ম হয় না। এই অবস্থা-প্রাপ্ত জীবের সঙ্গে ঠাকুর আর একটী উপমা দিতেন, সে উপমাটী—সিদ্ধধান। ধান আগুনে সিদ্ধ হ'লে তার যেমন আর অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি থাকে না, তেমনি জ্ঞানাগ্নিতে যে সকল পুণ্যবানেরা সিদ্ধ হন, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না। এমন কি, জ্ঞানী যদি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগও করেন, তবু আত্মহত্যাজনিত যে মহাপাপ, তাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

এক বস্তু, কিরূপে এত রকমারি হয়েছেন, রেত-শোণিতে কি রকমে হাড় হয়েছে, এ তত্ত্ব মা—লীলাশক্তির গোচর। প্রত্যেক রকমেই সেই এক বস্তুর সত্তা; শক্তির তারতম্যে

কেবল মাত্র ছোট বড় উনোতুনোরূপে পরিণত হয়েছে। যেখানে বেশী শক্তি, সেখানে বেশী বিকাশ, যেখানে কম শক্তি. সেখানে কম বিকাশ।

এখানে একটী মহা হিঁয়ালির কথা আছে, সেটী এই—বেশী শক্তির বিকাশ যেখানে, সেটীও যেমন স্বয়ং শক্তির ন্যায় অনন্ত অসীম, আর যেখানে কম শক্তির বিকাশ, সেখানেও অনন্ত—অসীম। 'যে দিকে যাবে, সেই দিকেই মূলশক্তির ন্যায় অকূল অপার। বড়টীও যেমন, ছোটটীও তেমন। অখণ্ডের খণ্ড হয় না। লীলাতে খণ্ড দেখায় বটে, কিন্তু 'সেই খণ্ডও অখণ্ডস্বরূপ অনন্ত ও অসীম। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণজী বল্‌তেন যে,—তুই ভগবানের ছোট ভাবটিও লিতে পার্‌বি নাই আর বড় ভাবটিও লিতে পার্‌বি নাই।

পা। যেখানে লীলা-শক্তির প্রভাবে খণ্ড খণ্ড হ'য়েছেন, সেখানে সেই অখণ্ড পরমাত্মা কি রকম ভাবে আছেন?

ভ। ঠাকুর বল্‌তেন, পিচকারীর ভিতর যেমন সেই পিচকারীর কাঠিটী থাকে অর্থাৎ নির্লিপ্ত ভাব। এই অবস্থায়, সেই অখণ্ড পরমাত্মার কার্য্য নাই, কেবল সাক্ষীস্বরূপ; আর খণ্ডরূপ জীবাত্মা সুখ-দুঃখ ভোগ করেন।

পা। আপনার মতে পরমাত্মাই মূল বস্তু; সেই পরমাত্মাই অগণ্য প্রকৃতির, আকারের ও গুণের জীবাত্মারূপে পরিণত, তা হ'লে মন, বুদ্ধি ইত্যাদি এগুলি কি?

ভ। জীবাত্মাকে তাঁর নিজের রস ও সৃষ্টির রস-সম্ভোগ করাবার জন্য মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্র সকল ক'রে দিয়েছেন। এরা জীবাত্মার রস সম্ভোগের যন্ত্রস্বরূপ।

জীবাত্মাতে মায়া থাকা হেতু জীবাত্মা, পরমাত্মা থেকে পৃথক হ'য়ে গেছে। জীবাত্মাকে আর জান্‌তে দিচ্ছে না যে, সে—সেই জিনিষ। সে মায়া নিয়ে "আমি" "আমি" ডাক ছাড়্‌ছে। এ দিকে রূপরসের সৃষ্টিখানি চোখের উপর দিয়ে কর্ত্তা তারই মধ্যে লুকিয়েছেন। জীবাত্মারা মজার রসের দুনিয়া পেয়েছে, আবার সেই সকল রস-সম্ভোগের প্রয়োজনমত যন্ত্রগুলিও পেয়েছে এখন আর তাদিকে পায় কে? এই দুনিয়া-কেই সুখের নিদান মনে ক'রে খেলা কর্‌ছে। কর্ত্তা ত সৃষ্টি ছেড়ে যান নাই,যদি কেহ সময়ক্রমে তাঁর আভাস পায়, তা হ'লে ঐ যন্ত্রগুলির সহায়েই তাঁকে ধ'রে ফেলে। যন্ত্রগুলির এমন গুণ আছে যে, তাদিগে যে দিকে চালাবে, তারা সেই দিকেই নিয়ে যাবে। রূপরসে চালাও, রূপরসই দেখাবে,আবার পরমাত্মা পানে চালাও, তাঁকেই দেখিয়ে দেবে। তবে একটা কথা,রূপরসে একবার মজ্‌লে সহজে আর অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া বড়ই মুস্কিল। একটা কথা মনে রেখ'। জীবাত্মারা মায়ার ঘোরে মনে করেছে যে, তারা স্ব স্ব প্রধান,স্বাধীন—কিন্তু তা নয়। সকলেরই মুখের লাগাম সেই কর্ত্তার হাতে আছে। তিনি যখন মনে কর্‌বেন, তখন তাঁর ভাণ্ডারে আর আর সব যন্ত্র আছে, সেই সব যন্ত্র দিয়ে ঐ রূপ-রসেমত্ত মনাদি যন্ত্রের গতি ফিরিয়ে দিবেন। এই সব যন্ত্রের নাম বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি। যে মন-বুদ্ধিতে এই বিশালক্ষীর দয়ে এনে ডুবিয়েছে, সেই তারাই আবার উদ্ধার ক'রে দেবে। এখন এই ধ'রে বুঝ', মন-বুদ্ধি জীবাত্মাতে কি প্রকারে অবস্থিত, আর তারা কি?

পা। জ্ঞান, ভক্তি কি জিনিস্?

ভ। ভক্তি—জিনিসটি যে কি, তা মুখে বল্‌বার সাধ্য নাই ; তবে এই ভক্তির একটা তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গটির কথা বরং কিছু বলা যায়। সে তরঙ্গটি কি জান'—সেটি ভগবদ্দর্শন ও ভগবৎ-সেবার স্বার্থশূন্য ঐকান্তিক প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি যে মূল-বস্তু থেকে জন্মায়, তার নাম ভক্তি। জিনিষটি ভগবানের ভাণ্ডারের একমাত্র মরকত এবং সেই জন্যই তিনি জিনিষটিকে বড় ভালবাসেন। জিনিষটি ত ভালবাসেনই, আবার এই জিনিষটি যে আধারে রাখেন, সে আধারটীও ভালবাসেন। ভক্তি-লাভের কোন উপায় নাই ; একমাত্র ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করে। তাঁর কৃপাই তাঁর ভক্তি। তিনি আপন ইচ্ছায় জীবকে দেন, সেটি কেমন জান'—ভগবানের স্বভাব ঠিক একটি শিশুছেলের স্বভাবের মত। বাবা, ছেলের হাতে একটি লাড়ু দিয়েছেন ; ছেলে লাড়ুটিকে খুব অঁাট ক'রে নিয়ে ব'সে আছে ; এমন সময় ছেলের বাপ কিম্বা কি কোন আত্মীয় যদি সেই লাড়ুটি চায়, তখন সে হয় ত দেওয়া দূরে থাক্, লাড়ু সহিত হাতটি পেটের ভিতর লুকিয়ে রাখ্‌বে ; আর বেজার হ'য়ে বল্‌বে—না, আমি লাড়ু দিব না। তার পরে (ছেলের যেমন স্বভাব) হয় ত পথে একজন অপরিচিত লোক চোলে যাচ্ছে, তাকে হাত বাড়িয়ে ডেকে, তার হাতে লাড়ু দিয়ে ফেল্‌বে। ভক্তি দিবার সম্বন্ধে ভগবানেরও এই রকম ব্যাপার। তিনি এই জিনিষটি পরকে দিয়ে, তাকে আপনার করেন। আগে ভক্তি-দান, পরে ভক্ত করা। ভক্তি দিয়ে ভক্ত করেন। এই ভক্তিটি পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর নিকটে ঠিক কষ্টি-পাথরের মত

রামকৃষ্ণজীও তাই কর্‌তেন। মনের মত হ'লে নিতেন, না হ'লে ছেড়ে দিতেন। বেণে যেমন যার হাত থেকেই হোক্‌ না কেন, সোনা হ'লেই আদর করে, ঠাকুরও তেমনি যার ভক্তি দে'খ্‌তেন, তাকেই আদর ক'র্‌তেন—তা কে জানে হিন্দু; কে জানে যবন; কে জানে ব্রাহ্ম; কে জানে খৃষ্টান। বেশ্যা, লম্পট কি মাতাল এদের মধ্যে যেথানে ঐ জিনিসটি দেখ্‌তে পেতেন, সেইখানেই আদর ক'র্‌তেন।

রামকৃষ্ণজী যে ভগবান্‌, তাঁর এই ভক্তি-প্রিয়তা স্বভাবই এক মহৎ প্রমাণ। যে কোন অবস্থার, যে কোন প্রকৃতির, যে কোন দেশের, যে কোন ধর্ম্মের, যে কেহ হোক্‌ না কেন, তার ভিতরে ভক্তি দে'খ্‌লেই, সে যেন ঠাকুরের আপনার চেয়েও আপনার। ঠাকুরের আর একটী স্বভাব দে'খেছ'? সেটি যে দেখ্‌বে, সেই সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, ঠাকুরই যেন নিজে সেই ভক্তি প্রিয় ভগবান্‌। যে যে আধারে ভক্তি আছে, সেই সেই আধারে যেন তিনিই বাস ক'রে আছেন। এক জন যার হৃদয়ে ভক্তি আছে, কিন্তু কোন কালে অর্থাৎ রাককৃষ্ণ-অবতারে কখন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা নাই, তাকে কোথাও একবার ঠাকুর দেখ্‌তে পেলেই, ছুটে গিয়া ধ'র্‌তেন আর অল্পকালমধ্যে তাকে আপনার ক'রে নিতেন। রাজ্যের মধ্যে যত দূরে যেখানে যত টেলিগ্রাফ্‌ অফিস আছে, সকলেরই সঙ্গে যেমন বড় টেলিগ্রাফ অফিসের সঙ্গে যোগ আছে, ঠিক তেমনি আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, যেখানে যে কোন ভক্তিমান চিত্ত আছে, তার সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর সাক্ষাৎ যোগ রয়েছে। এই বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য আমি নব্যভারতের বিংশ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যায়

২১০ পাতায় সাধ্বী-শবরী শীর্ষক এগার লাইনের নিম্নে যে লেখা আছে, সেটি পড়ি শুন' ;—

("সে দিবস পার্লামেণ্টের মেম্বর ডিগ্‌বী সাহেব পরমহংস রামকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কোন্ ভারত-সন্তানের মনে আশার সঞ্চার না হয়? ডিগ্‌বী সাহেব বলেন,'বর্ত্তমান শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রধান লোক রবার্ট ব্রাউনিং ও জন্ রাস্‌কিন ; কিন্তু তাঁহারাও নিরক্ষর রামকৃষ্ণের তুলনায় অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন') ।"

ভাই, ভক্তির মহিমা দেখ' আর ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর মহিমা দেখ'—কোথায় ঠাকুর রামকৃষ্ণজী আর কোথায় বা পূজনীয় ডিগ্‌বী সাহেব। সাহেবের ভিতরে ঠাকুর এমন একটি জিনিস রেখেছেন, ও মুগ্ধ হ'য়ে স্বদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদ্বয়কে ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্রতম মনে করেছেন। ধন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণজী আর ধন্য তাঁর ভক্তি! যেমন অন্ধকার দিয়ে আলোর মাহাত্ম্য বুঝা যায়, তেমনি অভক্তিমান্ হৃদয়ের মধ্য দিয়ে ভক্তিমানের মাহাত্ম্য লক্ষিত হয়।

কোথায় সাত সাগর পারে ডিগ্‌বী সাহেব, যিনি রামকৃষ্ণজীর নামটি শুনেছেন মাত্র, আর তাঁর উক্তি, উপদেশ ও জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনেছেন। এই মাত্র সম্বলে তিনি ঠাকুরের মহিমা বুঝ্‌লেন এবং ঠাকুরকে মহাপূজ্য জ্ঞানে অন্তরের মধ্যে রে'খে নানাবিধ মহিমার প্রবন্ধ লিখ্‌লেন ও জনসাধারণের মধ্যে স্বার্থশূন্য ও অভিমানশূন্য হ'য়ে ঢাক পিটিয়ে জানালেন।

আর এদিকে আমাদের স্বদেশী জাত ভেয়েরা, ঠাকুরের এত নিকটে থেকে, তাঁর কথাবার্ত্তা যাবতীয় নিজের কানে শুনে,

অলৌকিক জীবনী পর্য্যালোচনা ক'রে, ঠাকুরকে এক জন উন্মত্ত পাগল স্থির ক'রে ফেল্‌লেন। শুধু ঠাকুরকে উন্মত্ত স্থির করেই যে তাঁরা নিশ্চিন্ত আছেন, এমন নয়—সেই সঙ্গে, আপনাদিগকেও কিছু স্থির ক'রেছেন—স্থির করেছেন কি, তা জান' ?—যে, তাঁরা ভারি সেয়ানা, চতুর, বুদ্ধিমান্, গুণবান্, ধীমান্, শ্রীমান্, বীর্য্যবান্ অর্থাৎ যতগুলি মান্ বা বান্ আছে, সেই-গুলির একচেটিয়া অধীশ্বর।

সাহেবেরাই বা কি জন্যে ঠাকুরের মহিমা টের পেলেন আর জাত-ভাইরা অন্যবিধ বুঝ্‌লেন, তার কারণ—সাহেবদের হৃদয়ে ভক্তি আছে, আর এদের হৃদয় ভক্তিশূন্য। আমাদের ঠাকুরটিও সেয়ানের চেয়ে সেয়ানা। এদিকে ভারি দয়াল, কেহ খেতে পাচ্ছে না দেখ্‌তে পেলে, কেঁদে মাটী ভিজাতেন, কিন্তু ভক্তি-দানের বেলা কৃপণের চেয়েও কৃপণ। কেউ যে ভোগা দিয়ে কিছু হাতাবেন, এমন ছেলে সৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত কেউ জন্মান নি। ভক্তি-দানের স্থলে—এ দাতব্য যেখানে সেখানে হ'ত না। ভাবাবেশে ব'লতেন, "আমি মনে ক'র্‌লে আমড়াকে ফজলি কত্তে পারি, কিন্তু তায় আমার দরকার কি? আমার ফজলির বাগান রয়েছে।" কেউ ভক্তি প্রার্থনা ক'র্‌লে একটী গান গাইতেন, সেটী এই—

গীত।

"আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে হয় ত্রিলোক-বিজয়ী।
এক ভক্তি আমার আছে, বৃন্দাবনে গোপ গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে,
যাহার কারণে নন্দের ভবনে, পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই।
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই, মুক্তি মিলে অনেক ভক্তি মিলে কই;
যে ভক্তির জন্যে, পাতাল-ভবনে, বলিরাজার দ্বারে দ্বারী হয়ে রই।"

ভক্তির সম্বন্ধে বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরাই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এদের উদিকে আর গ্রাম নাই। এখন তুমি বুঝ' ভক্তি কি জিনিস।

ভক্তিও যে জিনিস, জ্ঞানও সেই জিনিস। তবে আস্বাদনে কিছু তফাৎ আছে; সেটী উপমা দিয়ে ভেঙ্গে বলি,শুন,—তুমি ত কাঁচাগোল্লা খেয়েছ',আর মিছরিও খেয়েছ', উভয়েই যদিও মিষ্টি, তবু মিছরির সঙ্গে কাঁচা-গোল্লার আস্বাদনে যেমন প্রভেদ, তেমনি জ্ঞান-ভক্তিতে প্রভেদ, ভক্তি কাঁচাগোল্লা, জ্ঞান মিছরি।

আর একটী বিষয়ে, এই দুয়ের প্রভেদত্ব কতটুকু, উপমা দিয়ে বলি, শুন', তুমি হুগলী-ব্রিজ বা গঙ্গার পোল দেখেছ'? পুলের দুধারে মানুষের গতিবিধির জন্য ফুটপাথ আছে এবং সেই ফুট-পাথের ধারে শক্ত বেড়া আছে—বেড়াটির উদ্দেশ্য সেই ফুট-পাথে দিয়া,মানুষ যে রকম ভাবেই যাক না কেন, পুল থেকে গঙ্গার জলে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা নাই। এখানে ভক্তি ঠিক পুলের ফুটপাথের মত আর জ্ঞানটি ঠিক বেড়ার মত। ভক্তি-পথে যেতে যেতে যদি কারও অসাবধানতা বশতঃ পদস্খলনের অবস্থা ঘটে, জ্ঞান এমত অবস্থায় তাকে রক্ষা করে। যেখানে ভক্তি আছেন, সেখানে জ্ঞানও আছেন। এর ঠিক উপমা জ্বলন্ত আগুন। যেখানে আগুন প্রজ্বলিত অবস্থায়, সেখানে পবনের অবস্থিতি থাকবেই থাকবে। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে জ্ঞান থাকেন, তাঁকে ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান বলে। আর যেখানে মিছরির অবস্থা, সেখানে নির্ম্মল, কঠোর ও কর্কশ। এবংবিধ জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির উপমা ও তুলনা, যা ঠাকুরের শ্রীমুখে কথিত, তা এই—জ্ঞান পুরুষ আর ভক্তি স্ত্রীলোকের প্রকৃতি-সম্পন্ন।

জ্ঞানের দ্বারাও ঈশ্বর-লাভ হয় আর ভক্তির দ্বারাও ঈশ্বর-লাভ হয় বটে, কিন্তু এর মধ্যে একটু বিশেষত্ব যা ঠাকুর ব'লতেন, তা এই,—একজন বড়লোকের যেমন সদরবাড়ী, অন্দরবাড়ী থাকে; সদর-বাড়ীতে সকলই যেতে পারেন, কিন্তু অন্দর-বাড়ীতে কেবল স্ত্রীলোকের মাত্র প্রবেশ অধিকার, পুরুষেরা সেখানে যেতে পারে না, তেমনি ঠিক ঈশ্বরেরও সদরবাড়ী অন্দরবাড়ী আছে, জ্ঞান পুরুষ-জাতি, তার সদর পর্য্যন্ত যাবার অধিকার। সদরে যদি ঈশ্বর রৈলেন, তবেই জ্ঞান দেখা পেলেন, নচেৎ অন্দর থেকে কখন্ ঈশ্বর সদরে আস্বেন, এই প্রতীক্ষা ক'রে জ্ঞানকে ব'সে থাকৃতে হয়; কিন্তু ভক্তি স্ত্রীজাতি, তিনি যদি দেখ্লেন, ঈশ্বর সদরে নাই, অমনি অন্দরে গেলেন ও ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা ক'র্লেন। ভক্তির সদর অন্দরে উভয় স্থানেই যাবার অধিকার আছে; জ্ঞানের অন্দরে যাবার অধিকার নাই। এই জ্ঞান ভক্তি, যার বলে ঈশ্বর-দর্শন হয়, যত দিন না লাভ হয়, তত দিন জীবাত্মার নানাবিধ দেহে প্রবেশ ও দেহ-ত্যাগ অর্থাৎ জন্মমরণের পথ আর বন্ধ হয় না।

পা। কথাগুলি বড়ই মজার শুন্ছি—"ধরি মাছ, না ছুঁই পানি"—এই ত আগাগোড়া ভগবানের কর্ম্ম দেখ্ছি; এখন একটা কথা জিজ্ঞাস্য, জীবাত্মা কি রকমে বা কেমন ভাবে দেহে প্রবেশ করে, আর কেমন ভাবেই বা দেহকে ত্যাগ করে?

ভ। তুমি চন্দ্র কি সূর্য্যগ্রহণে যে ভাব, তা দেখেছ? এখানেও সেই ভাব। চন্দ্র কি সূর্য্যকে যখন রাহু ধরে বা ছাড়ে, তখন রাহুকে কেউ দেখ্তে পায় না; তবে চন্দ্র কি সূর্য্যের অঙ্গে যে ক্রিয়া দেখা যায়, সেই ক্রিয়াই যেমন রাহুর চন্দ্রে কি সূর্য্যে প্রবেশ

বা চন্দ্র কি সূর্য্য পরিত্যাগের জ্ঞাপক; তেমনি দেহাধারের কার্য্য-কারিতাশক্তি বা তদভাবই জীবাত্মার দেহমধ্যে প্রবেশ এবং দেহত্যাগের পরিচায়ক। দেহের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণে জানা যায় যে, জীবাত্মা কখন্ দেহে আছেন বা কখন্ দেহ ত্যাগ ক'র্‌লেন। এ বিষয়ে একটী বড় সুন্দর কথা আছে—জন্মের সময় সদেহে আসেন, মরণের সময় সে দেহটী ত্যাগ ক'রে যান; এই আমার উপলব্ধি। দেহত্যাগের সময় দেহত্যাগ বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, কিন্তু জন্মের সময় দেহগ্রহণ কি রকমে হয়, এ বিষয়ে কোন উপলব্ধি নাই। জীবাত্মা, পরমাত্মার হাতের পুতুল। জীবাত্মা নিজেও জন্ম-মরণ জান্‌তে পারে না। মায়ার খেলার বেজায় কায়দা। মায়া, তোমাকে কোন রকমে জান্‌তে দেবে না যে, সে তোমাকে, তোমার ভিতর ঢুকে বেদের বানরের মত খেলাচ্ছে। যত দিন না মায়া ত্যাগ হয়, তত দিন ঘরের ভিতর প্রবেশের কোন উপায় নাই।

পা। মায়া যায় তবে কিসে?

ভ। মায়াকে চিন্‌তে জান্‌তে পার্‌লেই, সে পালায়—সে কেমন জান'—এক গেরস্থর ঘরে চোর প'ড়েছে, এমন সময় যদি গেরস্থ টের পায়, তা হ'লে চোর যেমন পালিয়ে যায়, তেমনি মায়াকে জান্‌তে পার্‌লেই মায়া ত্যাগ করে।

ঠাকুরের একটী সুন্দর গল্প শুন'—এক জন মন্ত্র-ব্যবসায়ী গোঁসাই বামুন শিষ্যবাড়ী যাবেন; তাঁর তল্পিদার নাই। এখানে সেখানে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একটা মুচির সঙ্গে দেখা হয়। ব্রাহ্মণ মুচিকে ব'ল্‌লেন, "ওরে আমার তল্পি নিয়ে যাবি?" সে ব'ল্‌লে, "ঠাকুর, আমি যে মুচি।" ব্রাহ্মণের খুব দরকার, তিনি ব'ল্‌লেন,

"তা তুই চল্, আমি কাকেও ব'লব' না।" মুচি স্বীকার হ'লো, কিন্তু সেই সঙ্গে ব'ল্লে যে, যদি কেউ আমাকে চিন্‌তে কি জান্‌তে পারে, তা হ'লে আমি তখনই পালিয়ে আস্‌ব'। ব্রাহ্মণ তাতেই সায় দিলেন। পরে তল্পি সাজিয়ে ঘর হ'তে বেরুলেন এবং এক ব্রাহ্মণ-শিষ্যের বাড়ীতে হাজির হ'লেন। মুচি ভয়ে চুপ চাপ মেরে এক ধারে আলাদা ব'সে থাকে।

এক দিন ঐ শিষ্য-বাড়ীর একজন, তল্পিদারকে ভাল জাতি জ্ঞানে অনুমতি করেন, "ওরে মুখ ধুব', ঝারিটা সরিয়ে দে ত।" তল্পিদার সশঙ্কিত, ভয়ে জড়-সড়, ঝারি ছুঁতে আর সাহস হয় না। মুচি যত সঙ্কোচ হ'য়ে আজ্ঞা-পালনে দেরি ক'রছে, ততই ঝারি সরিয়ে দিবার জন্য কড়া হুকুম বার বার উচ্চৈঃস্বরে বেরুচ্ছে। তল্পিদার নেহাত আজ্ঞা অপালন করায়, ব্রাহ্মণ রেগে ব'ল্লেন "বেটা, তুই মুচি না কি? ব্রাহ্মণ মানিস্ না?" তখন সে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ব'ল্লে, "ঠাকুর মহাশয়গো! আমাকে চিনেছে, আমি চল্লেম।" এই ব'লে দ্রুত বেগে পলায়ন। এখানেও ঠিক তাই; মায়াকে চিন্‌তে পার্‌লেই মায়া চ'লে যান্। তবে আর একটা কথা,—যিনি কামিনী কাঞ্চনে মুগ্ধ ক'রে রাখেন, তিনি অবিদ্যা মায়া। অবিদ্যা মায়া গেলেই বিদ্যামায়ার রাজ্য এসে গেল। এ রাজ্যের আর কূল-কিনারা নাই। যত দূর পথই যাও না কেন, বিদ্যামায়ার রাজ্য শেষ হয় না। শুনেছি, সমাধিস্থ হ'লে বিদ্যামায়ার পারে যায়—সে বহুদূরের কথা, তার আমার তিল মাত্র উপলব্ধি নাই। এখন আমি দেখ্‌ছি, সব শক্তির খেলা, গোটা ব্রহ্মাণ্ডই মা রাজ-রাজেশ্বরীর রাজ্য। মূল পরমা প্রকৃতি থেকে এই সৃষ্টি। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, মহেশ্বর ইহাঁরই আজ্ঞানুবর্ত্তী। সেই আদিপুরুষ একেশ্বর অবতাররূপে অবতীর্ণ হবার সময়, এই পরমা প্রকৃতির ভিতর দিয়ে তাঁকে আস্‌তে হয়, তাঁর শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে খেলা করেন, আবার তাঁর ভিতর দিয়েই তিরোহিত হন। ঠাকুরের মুখে শুনেছি—

অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়।
" কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয়, যায় লয়॥"

ঠাকুর ব'ল্‌তেন—অবতারেরা প্রত্যেকেই এই মহাশক্তি সাগরের এক একটী বুদ্‌বুদ্ মাত্র।

এই সৃষ্টিতে যা কিছু দেখ্‌ছ', বা শুন্‌ছ', বা বোধ ক'র্‌ছ, বা কল্পনা ক'র্‌ছ', সব সেই পরমা প্রকৃতিতে সৃষ্ট ও তাদের ভিতরে ঐ প্রকৃতিই আছেন। তিনিই দেহ, তিনিই দেহী; তিনিই যন্ত্র, তিনিই যন্ত্রী; তিনিই রথ, তিনিই রথী; তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি; সর্ব্বেসর্ব্বাণী তিনি।

প্র। মশায়! আপনার ভারি গোলমেলে ধাঁধার কথা, কেন না, কিছু পূর্ব্বে আপনি আত্মাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ব'লেছেন, এখন আবার শক্তিকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ব'ল্‌ছেন। যাঁর শক্তি, তাঁকে রাখ্‌ছেন ধামা ঢাকা, আর শক্তিকে ক'র্‌ছেন সর্ব্বেসর্ব্বা? আর এক কথা, প্রকৃতি শক্তিই যদি আধার আধেয় ও যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু, তবে পুরুষ গেলেন কোথা?

উ। রামকৃষ্ণজীর কথা—যত দিন গুরুর কৃপায় ঈশ্বর-লাভ ও আত্মদর্শন না হয়, তত দিন এই সকল ঈশ্বরীয় তত্ত্ব বড়ই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। ঈশ্বর লাভ না হ'লে হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি ও ছুটাছুটি ফুরায় না। কিন্তু একবার ঈশ্বর-দর্শন ও আত্ম-দর্শন

হ'লে অন্তর্জগৎ ও যাবতীয় তত্ত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় ও যাবতীয় সন্দেহ বিদূরিত হয়।

সেই অনাদি, অখিল, একেশ্বর, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, একটা বই আর দুটী বস্তু নয়। তাঁর দুটী অবস্থা; এক নিত্য, অপরটী লীলা। নিত্যাবস্থায়, তিনি কিমভুত কিমাকার, তা তিনিই জানেন, এইটুকু ব'লেই নিত্যাবস্থার কথা শেষ হ'লো, কিন্তু লীলাবস্থায়, সেই এক বস্তু এত রকমে পরিণত যে, তাঁকে তুমি যা বল্‌বে, তিনি তাই, আর সেই সম্বন্ধে দেখ্‌বার, বল্‌বার, শুন্‌বার এত, যে, যুগ-যুগান্তর দে'খে, ব'লে শুনে তার এক তিলও শেষ হবার নয়।

যিনি পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। একেই দুই বটে, অথচ উভয়ে অভেদ। দুয়ে মিলে এক। লীলার জন্য বা সৃষ্টির জন্য এক থেকে দুই হ'য়েছেন—সে কেমন রকম জান',— যেমন একটী ছোলা; জল পেয়ে দুটী দানাতে বিভক্ত, ফল হ'লো, দুই দানার মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম; তেমনি ঠিক এক বস্তু, পুরুষ প্রকৃতি ভাবে পরিণত হ'য়ে সৃষ্টির উৎপত্তির কারণ হ'লেন। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম স্বস্বরূপে তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, লীলার অবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টি কর্‌তে হ'লে তাঁর শক্তির প্রয়োজন হয়। সুধু মাটীতে যেমন গড়ন হয় না, তায় জল মিশান চাই, তেমনি লীলার স্থলে একা ব্রহ্মে কাজ হয় না, শক্তির বিশেষ প্রয়োজন। সেই এক বস্তুই লীলায় এক ভাবে পুরুষ আর এক ভাবে প্রকৃতি। বস্তুর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তবে লীলায় বিবিধ অবস্থাগত হ'য়ে প্রভেদ দেখাচ্ছেন মাত্র; যেমন ময়দা পেশা জাঁতা, জাঁতাতে আছে কি? দুখানি চক্রাকার প্রস্তর। একখানির উপরে আঁর

একখানি স্থাপিত। নিম্নকার পাথরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী কাঠের কীল আছে, আর উপরের প্রস্তরের ঠিক মধ্যস্থানে একটী ছিদ্র আছে। ছিদ্রের ভিতর কীলটী পরিয়ে দিয়ে, দুখানি প্রস্তরকে একত্র কার্য্য করানতে, কার্য্য-ফল যেমন ময়দা, ঠিক তেম্‌নি এক বস্তু দুই ভাবে পরিণত হ'য়ে উভয়ে কার্য্য করায় কার্য্যফল এখানে সৃষ্টি। তুমি তাঁকে সুধু পুরুষও বল্‌তে পার, সুধু প্রকৃতিও বল্‌তে পার, আবার পুরুষ প্রকৃতিও বল্‌তে পার। যেখানে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই ভাবে খেলায় রত, সেখানে তাঁর লীলাবস্থা। 'লীলাতে পুরুষের চেয়ে শক্তির খেলাই বিশেষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়—এই বিষয়ে ঠাকুরের উপমা কি জান'—ঘরে যেমন একজন কর্ত্তা আছেন, তিনি বুড় আর খুব গুড়ুক-খোর। রাতদিন তাঁর কর্ম্ম, খালি তামাক খাওয়া; কথা মোটেই কন না; নিহাত কথা কইতে হ'লে জোর বলেন, 'হুঁ'। আর বাড়ীর কর্ম্ম-কাজ যা কিছু কর্ত্তে বা দেখ্‌তে হয়, সব গিন্নীর উপর ভার। গিন্নী, খুব পাকা গিন্নী; কাজের যা ব্যবস্থা, তা সব জানেন ও করেন, কেবলমাত্র কর্ত্তার সায় নেবার জন্য একবার জিজ্ঞাসা করেন মাত্র। গিন্নী হাজার পাকা হ'লেও কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কোন কাজ করেন না আর কর্‌বার উপায়ও নাই। কাজের যত কিছু বেওরা, গিন্নী কর্ত্তার কাছে সব আউড়ে গেলেন; কর্ত্তা সবগুলি শুনে, উত্তর কল্লেন, 'হুঁ'। গিন্নী কর্ত্তার 'হুঁ'টি পেয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে তৎপর ফিরে এলেন, আর নানাদিকে নানা হুকুম চালিয়ে কাজ কর্‌তে থাকেন। কর্ম্মক্ষেত্রে যারা থাকে বা যারা আসে, তারা গিন্নীকেই সর্ব্বে-সর্ব্বা দেখ্‌ছেন ও বুঝ্‌ছেন। কর্ত্তা আছেন কি না, তার কোন

লক্ষণই পায় না ; এখানে লীলাক্ষেত্রেও তাই ; শক্তির খেলাই লক্ষিত হয় ও তাঁরই প্রাধান্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। লীলাতে রাজরাজেশ্বরী শক্তিরই রাজ্য ও কারখানা। জাঁতার দুখানি পাথরের মধ্যে নীচের খানি যেমন কেবল আছে মাত্র, উপরের খানিই ক্রিয়া করে ; তেমনি লীলার স্থলে পুরুষ আছেন মাত্র, কিন্তু যাবতীয় খেলা একমাত্র শক্তির। যতক্ষণ মন আছে, যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ তাঁর রাজ্যের ভিতরে ; তার ওপারে অর্থাৎ মন-নাশে ও অহং-নাশে যে কি অবস্থা বা কোথায় স্থিতি, তার আমি কিছু বোল্‌তে পার্‌লাম না।

পা। কখন্ তিনি কর্ত্তা আর কখন্ তিনি গিন্নী ?

উ। নির্গুণ অবস্থায় কর্ত্তা, সগুণ অবস্থায় গিন্নী। সেই একেরই এই উভয়বিধ অবস্থা। যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ। নির্গুণের আস্বাদ পাওয়া যায় না, সগুণের আস্বাদ পাওয়া যায়।

প। আপনি জীবাত্মার দেহান্তে, অন্য দেহধারণ বা পর-জন্ম মানেন ?

উ। খুব মানি। ইহ জন্ম, পরজন্ম ত মানিই, আবার জীবাত্মা, বস্তুর ছায়া-বহনের ন্যায় এক জন্মের কর্ম্মফল ও প্রকৃতি শুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে, যে জন্মান্তরে যান, তাও মানি। এই অতি গুহ্য রহস্যটি বুঝাবার জন্য ঠাকুর একটী গল্প ব'লেছেন, শুন,—এক রাজার চারটী ছেলে, ছেলেরা প্রাসাদের মধ্যেই থাকে ও খেলাও করে। একদিন রাজার ছেলেরা ও চাকরদের ছেলেরা খেলা কর্‌বার জন্য এক সঙ্গে সমবেত হয়েছে। রাজার বড় ছেলে, অন্য সকলকে বল্লে, 'এস ভাই, আমি রাজা', মধ্যম বল্লে,'আমি মন্ত্রী', সেজ বল্লে, 'আমি সেনাপতি।' রাজা উচ্চাসনে

বস্‌ল' মন্ত্রী করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান, সেনাপতি অন্যান্য ছেলেগণকে সৈন্য সাজিয়ে নিজে সেনাপতি হ'য়ে সজ্জিত। ছোট ছেলে এই সব দে'খে শুনে বল্লে—"না ভাই, আমি এ খেলা খেল্‌বো না।" কনিষ্ঠের এ খেলায় ভাবান্তর দে'খে বড় ভাই জিজ্ঞাসা কল্লেন, "তুমি তবে কি খেলা খেল্‌বে?" তখন সে উত্তর দিলে,'তুই উবুড় হয়ে শো, আমি তোর পিঠে কাপড় কাচি।' এই গল্প শেষ হবার পর ঠাকুর বল্লেন, 'এই যে ছোট ছেলে পূর্ব্বজন্মে ধোপা ছিল; কর্ম্মফলে রাজার ঘরে জন্মেছে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সংস্কার—কাপড় কাচা, এ জন্মেও বলবতী রয়েছে।'

ফুলাল্ তেল দেখেছ'—মনে কর, চামেলি তেল। চামেলির সৌরভ-রেণু রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, তেলের সঙ্গে চামেলি তেল করে। তৈলাবস্থায় যদিও ফুলের কলেবর থাকে না বটে, কিন্তু চামেলি নষ্ট হয় না— চামেলি বর্ত্তমান থাকে। সৌরভ-রেণুই বা সৌরভ-সম্পত্তিই চামেলির সারভাগ। সেই সারাংশ পূর্ব্বে পুষ্পাধারে ছিল, এখন তৈলাধারে—এই প্রভেদ মাত্র। চামেলি তেল-মধ্যে পরিণত হয়েও যেমন তেলের মধ্যে সেই চামেলিরই গন্ধ ও গুণ বর্ত্তমান,ঠিক তেমনি জীবাত্মা পূর্ব্বদেহ পরিবর্ত্তন ক'রে, অন্য দেহ ধারণ করলেও তার নূতন দেহে পূর্ব্ব-প্রকৃতি থাকে।

প। কর্ম্ম ও প্রকৃতির কারণ কে?

ভ। বাসনা, প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভোগ-বিলাস বা ইন্দ্রিয় সুখের ইচ্ছা। লোকে বলে শুনেছ' ত, "জপ-তপ-কল্লে কি হয়, মর্‌তে জানা চাই।" এর মানে, ঠিক দেহত্যাগকালীন জীব যদি বাসনা সহিত মরে, তা হ'লে সেই সব বাসনা ভোগ কর্‌বার জন্য পুনরায় তার জন্মগ্রহণ অবশ্যম্ভাবী। আর যদি ভগবানের

নাম বা তাঁকে স্মরণ করতে করতে দেহ রাখে, তা হোলে আর আসতে হয় না। অবিরত রসনা দ্বারা কি মনের দ্বারা ভগবানের নামাভ্যাস, কি তাঁর স্মরণ, কি মননাভ্যাসের নাম সাধনা। সাধনার উদ্দেশ্য এই, যেন তাঁকে অন্তিম সময়ে মনে হয়। তোমাকে পূর্ব্বে বলেছি, অবিদ্যা বিজড়িত মন, ভ্রান্ত অসৎ-বুদ্ধি সহায়ে অনবরত সঙ্কল্প বিকল্প দ্বারা ইহ-সুখের কল্পনা করছে, যথা—কি ক'রে ধন হবে, কিসে মান হবে, ছেলে হবে, বাড়ী বিষয় হবে ইত্যাদি। কল্পনার ক্রিয়া নিদ্রাবস্থাতেও বিরাম নাই। তুমি যখন হিসাব ক'রে এই বিষয়টি দেখ্‌বে, তখন দেখ্‌তে পাবে, ঠিক কুমোরের চাকার মত, কল্পনার চাকা রাত-দিন ঘুরুচে। এই ঘুরুনিটি বন্ধ করা চাই ; ইহার নাম নিবৃত্তি। এটি দু উপায়ে হয়। প্রথম ও প্রধান উপায়, ঈশ্বরের নাম করা, তাঁর সেবা করা, সাধু-সঙ্গ করা, তত্ত্বালাপ করা, মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে বাস করা ও তাঁকে প্রার্থনা করা।

পা। প্রার্থনাতে কি বোল্‌তে হবে? কি ব'লে প্রার্থনা করতে হবে?

ভ। বোল্‌তে হবে—হে ভগবান্! তুমি বই আর আমার কেউ নাই, যারা বা যা আছে, এ কেবল দু-দিনের জন্য, আর বলতে হবে, আমাকে ভক্তি দাও। ভক্তি ছাড়া আর কিছুই চাই না। ভক্তির বলে আমার মন-খানি যেন সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্মে লগ্ন থাকে।

পা। নিবৃত্তির আর দ্বিতীয় উপায় কি?

ভ। নিত্যানিত্য বা সদসদ্‌বস্তুর বিচার। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ—ছোট-খাট বাসনাগুলি ভোগ ক'রে নিও, আর বড়

গুলিকে বিচার দ্বারা মন থেকে তাড়িয়ে দিও। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করার নাম (ঠাকুরের কথা) মনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া। মন যাচ্ছিল মেটে-বুরুজের দিকে, তাকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দিবার নাম মোড় ফিরান'! এই মোড় ফিরাতে হ'লে, মন যে সহবাসে ছিল, তাকে অন্য সহবাসে নিয়ে আস্‌তে হবে; মন যে সঙ্কল্পে ছিল, তাকে তার বিপরীত সঙ্কল্পে আন্‌তে হবে, মন যে কাজে ছিল, তাকে ভিন্ন-কাজে আন্‌তে হবে। এইখানে তোমাকে সেই সাবেক কথা একটা বলি,—দেখ' মনই সকলের গোড়া। মন ফির্‌লেই সব ফির্‌বে। চৌদ্দপুয়া শরীরটাকে যাবতীয় কাজে, একা মনই, বেদের বানরের মত নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে যা বল্‌ছে, শরীর-টাকে তাই কর্‌তে হচ্ছে। মনকে বোল্‌তে হবে, ভাই, ওদিকে যেও না, ও জিনিস চেও না, ও পাবার জন্য ভেবো না, আর ওদের সঙ্গে থেকো না। এদিকে এস, এই চিন্তা কর, আর এইখানে থাক,—এর নাম মোড়-ফিরান। প্রবৃত্তির পথের মতন নিবৃত্তিতেও সঙ্কল্প আছে, সহবাস আছে ও কাজও আছে। তবে প্রবৃত্তির পথে যে ভাবের সঙ্কল্প, সহবাস ও কাজ; নিবৃত্তির পথে সেগুলি ভিন্ন-প্রকৃতির; এই মাত্র প্রভেদ।

অনেক পূর্ব্বে সেই মনের কথায় ব'লেছি,—মনের স্বভাব একটা—না—একটা বিষয়ে সে ষোল-আনা মাতোয়ারা; মাছের পক্ষে যেমন জল, তেমনি সে বিষয় ব্যতীত প্রাণে বাঁচে না; কিন্তু যদি একবার কোন উপায়ে তাকে বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ফিরিয়ে দিতে পার, তা হোলে পূর্ব্ব-বিষয়ে আর যেতে

চাইবে না। ঘোর প্রবৃত্তির পথ থেকে একবার ঘুরিয়ে নিবৃত্তিতে এলে আর প্রবৃত্তিতে যাবে না। যদিও অনেক কালের স্বভাব-বশতঃ এক একবার যায়, কিন্তু সে তখনি ফিরে আস্‌বে, আর নিবৃত্তির পথে তিন গুণ বলে অগ্রসর হবে। দেখ্‌লে বোধ হবে, যেন প্রবৃত্তির পথে একবার গিয়েছিল, সে কেবল খানিক গায়ে জোর বাড়াবার জন্য।

পা। জোর বাড়াবার কথাটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না—ভেঙ্গে বলুন। যে পথে গেলে মহাবল বলহীন হয়, সেখানে গিয়া বল বা জোর হবে কি ক'রে?

ভ। তুমি কখন কাউকে, নালা কি বড় খানা ডিঙ্গুতে দেখ নাই? যদি কোন লোককে একটা খাল লাফিয়ে এ-পার থেকে ও-পারে যেতে হয়, তা হোলে সে কি করে? প্রথমে সে খানিক পেছু দিকে হোটে যায়, তার পর সেখান হ'তে দৌড়ে এসে খাল্‌টা কুঁদে লাফিয়ে পড়ে। এখানে যেমন পেছিয়ে যাওয়া, গায়ে জোর-সঞ্চারের জন্য, ওখানেও তাই। তবে খাল-পারের সময়ে স্বেচ্ছায় পেছু হটে যাওয়া আর ওখানে ভ্রমবশতঃ যাওয়া—এইটুকু তফাৎ। কাজ কর্‌তে কর্‌তে এই সকল বিষয় স্বতই বুঝা যায়! অবস্থায় না পড়্‌লে এই সব তত্ত্ব উপলব্ধি হয় না। কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। কাজের দ্বারাই প্রবৃত্তিতে গিয়াছে, আবার কাজের দ্বারাই নিবৃত্তিতে ফির্‌তে হবে? প্রবৃত্তি—প্রবৃত্তির কাজে যেমন হ'য়েছে, নিবৃত্তিও—নিবৃত্তির কাজে হবে। তবে এ কথা স্বীকার্য্য যে, প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তির অভ্যাসে অনেকটা কষ্ট আছে ও শ্রম আছে ; সে কষ্ট ও শ্রম কেমন জান',—মনে কর—আমি

কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটায় থাকি। এই স্থানের উত্তরে তিন ক্রোশ অন্তরে দক্ষিণেশ্বর, আর এর দক্ষিণে তিন ক্রোশ অন্তরে মেটিয়াবুরুজ। মেটিয়াবুরুজের পথ যেন প্রবৃত্তির পথ; আর দক্ষিণেশ্বরের পথ যেন নিবৃত্তির পথ। আমি মেটিয়াবুরুজের পথে গিয়া সেখানে হাজির। ভুক্ত-ভোগী হ'য়ে এখন বুঝেছি, এ অতি অশান্তির স্থান। শান্তির স্থানের অনুসন্ধান করায় বুঝ্‌লাম; দক্ষিণেশ্বর যাওয়া বই আর উপায় নাই। এখন আমায় কি কর্‌তে হবে? মেটিবারুজ থেকে পুনরায় পাথুরিয়াঘাটায় আস্‌তে হবে। এই ফিরত পথে আমাকে হাড়ির হালে পড়্‌তে হবে। এখানে বড কষ্ট, বড় শ্রম। পরে যখন পাথুরিয়াঘাটা থেকে উত্তরে দক্ষিণেশ্বরের পথে যেতে আরম্ভ করব' তখন প্রাণে শান্তির সঞ্চার হবে। "পরে যতই এগুবে' ততই শান্তি বৃদ্ধি হবে। এ পথেও যেতে যেতে সাবেক সংস্কার-বশতঃ মন বার বার মেটেবুরুজের অঞ্চলের তরঙ্গে ফেল্‌বে, কিন্তু এতে ভাল বই আর মন্দ হবে না। কণ্ঠস্থ অর্থ ভুলে গিয়া, অন্য অর্থ মুখস্থ করায় যে রকম কষ্ট; উদরস্থ ভোজ্য উদ্গীরণ দ্বারা পাকস্থলীকে অন্য ভোজ্য ধারণের উপযোগী করায় যেমন কষ্ট, প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিতে আসা তেমনি কষ্ট। আর একটী কথা, নিবৃত্তির পথে অগ্রসর হ'লে যতই কষ্ট আসুক না কেন, এতে পথিককে উদ্দেশ্য পথে অগ্রগামীই ক'রে থাকে। সে কষ্ট, কি যাতনা, কি শ্রম তার মহাকষ্ট, মহাযাতনা ও মহাশ্রমের রক্ষা-কবচ' পথিকের অবস্থায় না পড়্‌লে, পর্য্যটনের বিষয় যেমন ভাল উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে না এলে এই সকল বিষয়ের জ্ঞান জন্মে না।

তাই ঠাকুর বোল্‌তেন—সাধনাসাগরে না ডুব্ দিলে রতন মিলে না। কর্ম্ম কর' কর্ম্ম চাই—সিদ্ধি সিদ্ধি ব'লে চেঁচালে নেশা হয় না। সিদ্ধি আনা চাই, বাটা চাই, উদরস্থ করা চাই, তবে নেশা হবে। কর্ম্মই প্রবৃত্তি, নিবৃত্তির মূল। প্রবৃত্তিমার্গে যেমন প্রবৃত্তি-কর্ম্মযোগে প্রবৃত্তিরাজ্যে এসে পড়েছি, তেমনি নিবৃত্তিমার্গে নিবৃত্তি-কর্ম্মযোগে নিবৃত্তি-রাজ্যে আস্‌তে হবে। উভয় স্থানেই সেই এক কর্ম্ম। কর্ম্মের সাধারণী নাম কর্ম্ম বটে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কর্ম্ম আছে ; সুতরাং তাদের ফলও নানা প্রকার। আম, কাঁঠাল, আতা, আনারস, এগুলিও ফল, আবার কুঁচলেও ফল। আম আতা দেহের পুষ্টিকারক, আর কুঁচলে প্রাণনাশক ; সেই প্রকার কর্ম্মও নানা জাতির, কোন কর্ম্মে বাঁচায়, কিসেও নষ্ট করে। প্রবৃত্তিমার্গের কর্ম্মাচরণে কেবল তৎপ্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মকেই বৃদ্ধি করে ও জীবকে দুর্ভেদ্য ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ করে ; আর নিবৃত্তি-মার্গের কর্ম্মে, কর্ম্মের হ্রাস ও বন্ধন-মুক্ত করে।

পা। আপনি যে যে কার্য্যের সহায়ে নিবৃত্তিতে আস্‌তে হবে বোল্‌ছেন, এ সবগুলিই যে ভারি কঠিন। সংসারে ঘোর ভোগবাসনার আসক্তি। এ আসক্তি যে কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না—এর উপায় কি ?

ভ। ফিরে ঘূরে প্রকারান্তরে সেই এক কথা। ছাড়্‌বার মত কর্ম্ম কর। একবারে ছাড়ে না বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যে ছাড়্‌বে না, এমন কিছু কথা নয়। মহাব্যাধি সত্বর আরোগ্য হয় না, তবে রীতিমত ঔষধ পেলে, ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হয়। তেঁতুলতলায় বাস ক'রে, তেঁতুল খেয়ে রোগ ক'রেছ',

এখন নিমতলায় যাও, নিমপাতা খাও, নিমতলায় বসতি কর, তবে রোগ যাবে। তুমি এখনও সেই তেঁতুলতলায় রয়েছ,' এখান থেকেই রোগ গেল না, রোগ গেল না ব'লে চেঁচালে কি হবে?

পা। খুব সহজ উপায় কি বলুন দেখি, যাহাতে ঈশ্বর-লাভ হয়?

ভ। ঠাকুর রামকৃষ্ণজী এই সম্বন্ধে একটী গীত গাইতেন, সেই গানটি শুন—'

হরি সে লাগি রহ রে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই,
শুগা পড়ায়্‌কে গণিকা তারে, তারে মিরাবাই॥
এসা ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই,
সেবা বন্দি আউর দীনতা সহজে মিলি রঘুরাই॥

বিষয়-ঘাঁটা মলিন বুদ্ধির কপটতা ও চতুরতা পরিত্যাগ ক'রে ভগবানে লেগে থাক', তা হ'লেই তুমি ভগবান্‌কে পাবে।

পা। তাঁকে না পেলে, তাঁয় কি ক'রে লেগে থাক্‌বো? আমাকে ভেঙ্গে বলুন, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

ভ। আমি তোমার সঙ্গে এত দিন রামকৃষ্ণজীর মহিমা-কথার প্রসঙ্গে কাটাচ্ছি। আমি তোমার কথা শুনে বেশ বুঝেছি, তুমি সাকারবাদী; কৃষ্ণরূপ ভালবাস। তোমার বাড়ীতে কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে; তুমি ফুল-চন্দন দিয়ে নিত্য নূতন বেশ ক'রে দিয়ে সাজাবে। তোমরা থিয়েটারের লোক, সাজান' বিষয়ে বিশেষ বুঝ'। যেমন থিয়েটারে বিল্বমঙ্গলে কৃষ্ণ

সাজাও, ঠিক তেমনি ক'রে তোমার ঠাকুরটীকে সাজাবে। গ্রীষ্মকালে গায়ে বাতাস দিবে, শীতে গায়ে কাপড় দিবে, সুন্দর বিছানা ক'রে দিবে, যেখানে যা ভাল জিনিস পাবে, কৃষ্ণের জন্যে আন্‌বে আর সকলের সার, ছানা-মাখনের ভোজ্য এনে ভোগ দিবে। ভোগ দিবার সময় কেঁদে কেঁদে ব'লো, কৃষ্ণ! তোমায় খেতে হবে। কখনও বা কৃষ্ণলীলা পাঠ কর্‌বে, আর কখন বা যাঁরা কৃষ্ণের দেখা পেয়েছেন বা কৃষ্ণকে ভালবাসেন, তাঁদের সঙ্গ কর্‌বে। এই সকল কাজে থাক্‌লেই তোমার তাঁয় লেগে থাকা হবে।

পা। মহাশয়, ঐ কথাটি শুনে আমার মনটা কেমন কচ্ছে —যেখানে আপনি ব'ল্লেন, কেঁদে কেঁদে ব'লো—কৃষ্ণ, তোমায় খেতে হবে! সত্য কি তিনি খাবেন ?

ভা। নিশ্চয় খাবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রেখ' না। আমি ভগবান্‌কে খেতে দেখেছি।

পা। বলেন কি মহাশয়? আপনার কথা শুনে গা শিউরে উঠ্‌লো, আর আমার ভারি কান্না পাচ্ছে। আমি অতি নরাধম, মলিনাত্মা, যাবতীয় অপকর্ম্মে কলঙ্কিত, আমার ছোঁয়া জিনিস কি ভগবান্ খাবেন ?

ভা। হা রামকৃষ্ণজী! আমি আগে ঐ রকম মনে কর্‌তাম, কিন্তু রামকৃষ্ণজীর কৃপায় আমার সে সন্দেহ গেছে, সে সন্দেহ দূর হ'য়েছে। বলি, তবে শুন'—তুমি যেমন তোমার নিজের মধ্যে মলিনতা দেখ্‌ছো, পাপ কালিমা দেখ্‌ছো, তেমনি যদি ভগবানের করুণার কিছু আভাস দেখ্‌তে পেতে, কি জান্‌তে পার্‌তে; তা হোলে ও কথা আর মুখে আন্‌তে পার্‌তে না।

ভগবান্ যে করুণার সাগর, দয়ার নিধি। আমি যতই পাপ করি না কেন, সে দয়ার সাগরের কাছে কিছুই নয় এক দুয়াত কালি যদি তুমি দীঘির জলে ঢেলে দাও, তা হোলে কালিটী কি আর কালি থাকে? সে দীঘির জলে মিশিয়ে দীঘির জল হয়। এক বিন্দু শিশির, সে কি সূর্য্য ঠাকুরের কাছে যেতে পারে? লোক লোকান্তর অন্তর থেকেই শিশির কোথায় উবে যায়। যে ভগবান্ কারাগারে জন্মগ্রহণ করেন, যে ভগবান্ ভক্তের দায়ে নিজে বাঁধা যান, যে ভগবান্ গোপ-বালকের উচ্ছিষ্ট খান, যে ভগবান্ ব্রাহ্মণের পদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করেন, যে ভগবান্ নিজের রক্ত দিয়ে জীব-জন্তুকে পালন কচ্ছেন, সেই ভগবান্,—তুমি কোথায় একটুকু কি ক'রেছ', এইটী খতিয়ে নিয়ে ব'সে আছেন? ছি! ছি! দয়ার সাগর ভগবানে ও কলঙ্ক দিও না।

তাঁর করুণার সীমার একটুকু আভাস যদি লোকে পেতো, তা হ'লে তাঁকে একটা প্রণামও কেউ কর্‌তো না, কেউ তাঁকে খাতিরেও আন্‌তো না। তাঁর দয়ার পার নাই, কূল-কিনারা নাই। বাপের তুলনায় দেখ'না, ছেলের যতই দোষ হোক না কেন, মা বাপ মোটেই গ্রহণ করেন না। আর ভগবান্ যিনি জগতের মা বাপ, যার পরম পিয়ারের এই জীব-জগৎ—এই সৃষ্টির উপর তাঁর বাৎসল্যের উত্তাল তরঙ্গ এত প্রবল যে, সেখানে কোটি কোটি অপরাধের সাগর ঢেলে দিলে কোথায় যে তলিয়ে যায়, তার আর খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না!

দয়াময় রামকৃষ্ণজীর কাছে তাঁর অপার করুণার আভাস পেয়ে, তোমাকের গিরীশবাবুই ঠাকুরের চরণ-দুটি লক্ষ্য ক'রে ব'লেছিলেন যে, হায় হায়! পাপ ঢাল্‌বার এমন নরদমা পাব'

ব'লে যদি আগে জানতাম, তা হোলে মনের সাধে, পেট ভ'রে পাপ ক'রে পাপ করার সাধ মিটিয়ে নিতাম। এখন দর্শন ক'রেছি আর পাপ করবার উপায় নাই।

পা।—কেন মহাশয় রামকৃষ্ণজীকে দর্শন করলে কি আর পাপকর্ম্ম করা যায় না?

ভ।—সাধ্য কি? ভগবদ্দর্শনের অদ্ভুত ফল। যেমন প্রজ্ব-লিত আগুনে শুষ্কপাতা চকিতে ভস্মীভূত হয়, তেমনি তাঁর দর্শনমাত্রেই কোটি কোটি জন্মের যাবতীয় পাপরাশি একেবারে বিনাশ হয়। পাপ-নাশের সঙ্গে আর একটা নাশ হয়—সেটা কি জান',—সেটা পুনর্জন্মের অঙ্কুর। ঈশ্বর দর্শন হ'লে, আর জন্ম হয় না। একটি গানের একটুকু বলি, শুন'—

"জয় জগতজীবন জগবন্ধু।

শুনেছি পুরাণে কয়, পুনর্জন্ম নাহি হয়, বারেক হেরিলে মুখ ইন্দু॥"

পাপ-মুক্তির পর অন্তর পবিত্র হ'লে জীব আর পাপকার্য্য করতে পারে না।

পা।—ভগবানের জীবে যদি এত দয়া, তবে লোকে যে রোগে, শোকে, অর্থাভাবে অশেষ কষ্ট পাচ্ছে, তিনি মুক্ত করেন না কেন?

ভ।—তুমি যদি নিজের হাতে নালা কেটে, বেনো জল ঘরে ঢুকাও, তাহোলে তাঁর দোষ কি? কর্ম্মের একটা নিয়ম আছে আর কর্ত্তাকে কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়, একথা স্বীকার কর ত? তিনি যে কাজ তোমাকে নিষেধ করেছেন, তুমি তাই করছো। তিনি বলছেন, আগুনে হাত দিও না, তুমি আগুনে হাত দিচ্ছ, পুড়বে না ত কি? তিনি ভাল মন্দ বিশেষভাবে

দেখিয়ে দিচ্ছেন, ব'লে দিচ্ছেন তুমি আপন ইচ্ছায় ভালটীর দিক দিয়ে যাবে না, কেবল মন্দটীরই সহবাসে থ'ক্'র। সুতরাং তে'মার রোগ, শোক অভাব ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী ভোগ্য। যে যেমন জন্তু তার সহবাসে, তুমি তারই যা আছে, তাই পাবে। সাপের কাছে থাক'—বিষ পাবে; কামধেনুর কাছে থাক'—ক্ষীর পাবে। কামিনী-কাঞ্চন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী অবিদ্যা—সাপিনী, তুমি সর্ব্বদাই তার চিন্তায়, তার সহবাসে আছ, সুতরাং রোগ, শোক, দুঃখ বই আর কি পাবার প্রত্যাশা কর্‌তে পার? সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী কামধেনুরূপা জগন্মাতার চিন্তায়, সহবাসে থাক', অবশ্যই শান্তি-ক্ষীর পাবে।

একটা কথা, শুন'—বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, মন্ত্র, গীতা, পুরাণাদি এই যে শাস্ত্রের মহতী ভাণ্ডার—এ কি, জান'—এইগুলি সব ভগবদ্বাক্য, এসব তাঁর নিজের শ্রীমুখের উক্তি। এই যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে, তিনি কেবল একটী কথা বল্‌ছেন, সে কথাটি এই—"রে জীব! তোমাকে আমার উপাসনা ক'র্‌তে হবে না, আমার জন্য তপস্যা বা সাধনা কর্‌তে হবে না, আমার সেবা কর্‌তে হবে না তুই যাতে সুখে থাকিস্, তুই তাই কর্, আমি তা হলেই খুব খুসী।"

ভগবান্ শ্রীমুখে বল্‌ছেন এইটী, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকৌশলে এমন একটি ফিকির-কল ক'রে রেখেছেন যে, জীব নিজের সুখের কি মঙ্গলের কাজ কর্‌তে গেলেই, ভগবানের আরাধনা, তপস্যা বা সাধনা-কর্ম্ম ভিন্ন, অন্য কোন কর্ম্মপথেই তার সুখ কি মঙ্গলের আশা নাই; সুতরাং জীবকে বাধ্য হ'য়ে, তাঁর সেবা, আরাধনা ও সেবা কর্‌তে হয়। সৃষ্টির মধ্যে একা ভগবান্ বই শান্তি-সুখের আশা আর কিছুতেই নাই।

কিন্তু হতভাগ্য জীব, এমন দিশেহারা, এমন কাণা, এমন বধির যে, সেই গিল্‌টীর কামিনী-কাঞ্চন ছাড়া, সাক্ষাৎ কাঁচা-সোনা ভগবান্—তাঁর দিক্ দিয়েই যাবে না, সে রূপই দেখ্‌বে না, তাঁর কথাই শুন্‌বে না। জীব একান্ত বেবাগ হ'লে, দয়ার সাগর স্বয়ং মূর্ত্তি ধ'রে মানুষের মত হ'য়ে বাগ মানাতে আসেন; তবু কি চোখ চেয়ে দেখে? ভগবান্ দয়ার ভরে অস্থির; সুতরাং তাঁকে নিজের দায়ে, জীবের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বাগ মানাতে যেতে হয়; তখন জীব ভগবান্‌কে না-ছোড়-বান্দা দে'খে, কি করে জান'—ভগবান্‌কে পাগল জ্ঞানে হেসে উড়িয়ে দেয়। ভাই, জীবের কথায় জিব্ বেরিয়ে পড়ে। বুঝ', এর নাম জীব, দেখ', এই জীবের বুদ্ধি! এদিকে ঐ বুদ্ধিতে আকাশে উড়্‌ছে, দু-বছরের পথ তিন দিনে যাচ্ছে, এক দেশ থেকে অপর দেশে পাঁচ মিনিটে খবর পাঠাচ্ছে, মহাবল পাঁচটা ভূতকেই ক্রীতদাসের মত হুকুমে খাটাচ্ছে, অঙ্গহীনের অঙ্গ ক'রে দিচ্ছে, আর কত শত অদ্ভুত কাজ কর্‌ছে। বুদ্ধির চোটে গোটা পৃথিবী থরথরি কম্পবান্, কিন্তু ঈশ্বরের বিষয়ে এলেই, সেই বুদ্ধি একে-বারে ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়ে। তেলির ছেলেকে লাঙ্গলে কোদালে কাস্তেতে দেখ্‌তে পাবে, যেন সাক্ষাৎ ভীম, কিন্তু ক খ শিখ্‌বার বেলা, আর তার বুদ্ধি বেরোয় না; যদি কিঞ্চিৎ বেরোয়, সেটা যেমন হোরমিলার কোম্পানীর গাধাটে ভড়, মোলেও এগুতে চায় না। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ বা ঈশ্বর-তত্ত্বে জীবের বুদ্ধিও এই রকমের।

জীব, নিজের মঙ্গল, নিজের সুখ কিসে আছে, তা চিন্‌তে জানে না। যখন সুখের কারণ জান্‌তে পারে, তখন দুনিয়ার যাবৎ বস্তু ছেড়ে দিয়ে, সেই ভগবানের মধ্যে, সেই ভগবানের

সঙ্গে বাস কর্‌তে প্রয়াস পায়। সংসারের কোন বস্তুতে কেহ কখন কিছু সুখই পায় না; যাবতীয় পুরাণ তার সাক্ষী। সংসারকে সুখের আকর জ্ঞানে, যে এর আশ্রয় নিয়েছে, সেই শেষে প্রাণে সারা গেছে। সংসার কেমন জান'—যেমন কলাই-ভাঙ্গা জাঁতা জাঁতার মধ্যভাগে একটি কাঠের কীল আছে; যে কলাই-দানাটী সেই কীলের কাছে থাকে, সে আর ভাঙ্গা যায় না, বাকি যত দানা সব ভাঙ্গা যায়, কেউ বা গুঁড়ো হয়ে যায়। জাঁতায় যেমন কীলটি রয়েছে, তেমনি সংসারে ভগবান্ রয়েছেন। তুমি সংসারে ভগবানের কাছে যদি থাক্‌তে পার', তা হোলে আর পেষা যাবে না। জাঁতায় কীলের কাছে যেমন কলাই-দানাটী রক্ষা পায়, তুমিও তেমনি সংসারে ভগবানের কাছে থাক্‌লে রক্ষা পাবে। কীল পরিত্যাগ ক'রে জাঁতার অন্য স্থানে গেলেই জাঁতা তার কর্ম্ম কর্‌বে; ঠিক তেমনি ভগবান্‌কে ছেড়ে সংসারে থাক্‌লেই ত্রিতাপ, অশান্তি অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য। ভগবান্ জীবকে আঁস্তা-কুঁড় ও সোনা-কুঁড় দুই-টীর কথা ব'লে দিয়ে সংসারে ছেড়ে দিয়েছেন। তুমি যদি আঁস্তা-কুঁড়েই যাও, তিনি কি কর্‌বেন? ভগবান্ কল্পতরু, তুমি তাঁর কাছে যা চাইবে, তিনি তাই দিবেন। চোর যখন মা-কালীর পূজা ক'রে বর চায়, তখন কি তিনি বলেন যে, তোকে বর দিব না। তিনি মানস-পূজার জন্য চোর ও সাধু উভয়কেই বর দেন। তিনি কর্ম্মের সঙ্গে তার ফল বেঁধে রেখেছেন। চোর চুরির ফল পায়, সাধু তাঁর আরাধনার ফল পায়। এখন তুমি বুঝ্‌লে ত, যে জীব নিজের দোষে কষ্ট পায়, আর ভগবান্ দয়াময়, করুণাময় ও মঙ্গলময়।

পা। শুনা যায়, জীব মাতৃগর্ভে যোগাবস্থায় থাকে; ভগবানে সংযতচিত্তে থাকে, একথা সত্য কি?

ভ। ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর শ্রীমুখে এ বিষয় কিছু আমি নিজে শুনি নাই বা অন্য কারও কাছে তিনি এ সম্বন্ধে যদি কিছু ব'লে থাকেন, তাও শুনি নাই; তবে তিনি আমাকে যতটুকু বুঝাচ্ছেন, তাতে বোধ হয়, কথা সত্য। আরও একটি মহাজনের পদে শুনেছি-

গর্ভে যখন, যোগী তখন, মাটীই প'ড়ে খেলাম মাটী,

মহাজন-বাক্য অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য। জীবের শৈশবাবস্থায় প্রকৃত সাধকের লক্ষণ দেখা যায়, অনেক সময়েই বালকের মুখে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য শুন্‌তে পাওয়া যায়; ঠাকুর রামকৃষ্ণজীও বল্‌তেন, সিদ্ধাবস্থায় জীবের বালকের মত স্বভাব হয়। সাধু-ভক্তের ন্যায় বালকের মধ্যে সরলতা বড়ই প্রবল। বালক সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণের কারুর বশ নয়। বালকের এবংবিধ স্বভাব-প্রকৃতি, সরলতা ইত্যাদি থাকা মাতৃগর্ভে যোগীর অবস্থায় থাকার পরিচায়ক।

পা। এখন এসব কথা থাক্। আপনি একটা মনের কথা, ভারি টেনে বোলেছেন। আমি সত্যই কৃষ্ণ ভালবাসি, তাকে খাওয়াতে ভালবাসি। মনে মনে জানি, কৃষ্ণ বেশ, পেলে, নিয়ে নানারকমে সাধ মিটাই। এত দিন ভাবটা চেপে রেখেছিলাম, কিন্তু আজ আর রাখ্‌তে পারলাম না। কৃষ্ণে ভারি সক্, মনের সক্ মনে মনেই মিটাই; বোল্‌তে পারেন—ছোকরাকে পাওয়া যায় কি ক'রে? আপনারা বলেন রামকৃষ্ণজী ভগবান্, কৃষ্ণও ভগবান্, কিন্তু রামকৃষ্ণরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণরূপটিতে কেমন একটী বিশেষ নেশা। বোধ করি, কথাটী আপনাকে বড় ভাল লাগ্‌বে না, কেন না, আপনারা রামকৃষ্ণরূপে মুগ্ধ; তাঁকেই সর্ব্বেসর্ব্বা জানেন,

তাঁরই লীলাকথা আন্দোলন করেন, তাঁরই নাম পূজা-উৎসবাদিতে প্রমত্ত।

ভ। ছি ছি, তুমি এমন কথা বল' যে, কৃষ্ণকথা, কি কৃষ্ণরূপ কি কৃষ্ণভক্ত ভাল লাগ্‌বে না। তুমি কৃষ্ণ-প্রিয়, কৃষ্ণানুরাগী, আমার পরম যতনের জিনিস। তুমি কৃষ্ণানুরাগী বোলেই রামকৃষ্ণজীর দর্শন লাভ করেছ'। সেই কৃষ্ণই এই রামকৃষ্ণজী; তফাতের মধ্যে এবারে খেলার বর্ণটা বড় ঘোর করেছেন আর সাজটা একদম বদ্‌লেছেন। তবে কি জান', যেখানে জানিয়ে দিচ্ছেন কি দেখিয়ে দিচ্ছেন, সে দেখ্‌ছে—একই দুধ, কখন মাখন, কখন দই, কখন, মালাই, কখন রাবড়ি, কখন ঘি। দইই বল' আর মাখনই বল' আর ঘিই বল' সেই এক দুধেরই অন্যরূপ অবস্থা; তফাৎ থাকে আকারে আর স্বাদে। ঠিক এই রকম ভগবান্, যে ভাবেই আসুন বা যে রূপেই আসুন, তাঁর ভিতরে সেই তিনি।

রামকৃষ্ণজী অন্তর্যামী, প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে আছেন। যে কোন রূপে, বা যে কোন ভাবে সরল অন্তরে ভগবানের চিন্তা যিনি একবার ক'রেছেন, তাঁকে রামকৃষ্ণজীর কাছে আস্‌তে হ'য়েছে ও হবে। রামকৃষ্ণজীও বার বার ভাবাবেশে ব'লেছেন, যে ব্যক্তি সরল প্রাণে একবার তাঁর চিন্তা ক'রেছে, তাকে এখানে আস্‌তে হবে।

পা। যে ব্যক্তি রামকৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্যরূপের আকাঙ্ক্ষী, রামকৃষ্ণজী তাকে নিজের কাছে আকৃষ্ট ক'রে নিয়ে গিয়ে কি করেন?

ভ। প্রথমতঃ তিনি ভক্তের অভিলষিত রূপের কথা, তাঁর গুণের কথা, লীলার কথা প্রকাশ্যে ও গোপনে সেই ভক্তকে শুনান। এতে কি কাজ করা হয় জান'? সেই ভক্তের অভিলষিত রূপে অধিকতর ব্যাকুলতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার পরে ঠাকুর

যখন দেখেন, ভগবানের উপর এবারে খুব টান বেড়ে গেছে, তখন ভক্ত যেখানে যেতে চান, যে রূপ দেখ্‌তে চান, সেখানে সঙ্গে নিয়ে সেই সাধের রূপটী দেখিয়ে দেন। এখন তিনি পথে কোন রূপেই জান্‌তে দিবেন না, যে, ভক্তের অভিলষিত রূপটি, রামকৃষ্ণজীরই নিজের অন্যবিধ রূপ। এমন ধারা খেলা করেন কেন জান' ? রামকৃষ্ণজী কারও ভাব নষ্ট করেন না। যে কৃষ্ণ ভালবাসে, তাঁর কাছে কেবল কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণলীলার মাধুরী বর্ণন ও প্রদর্শন, কৃষ্ণ-সঙ্গীত ; যে কালীরূপ বাসে, তার কাছে খালি কালী-কথা, শ্যামা-সঙ্গীত।

যিনি নিরাকারবাদী, তাঁর কাছে চূড়ান্ত বেদান্তের কথা ; সগুণবাদীর কাছে সগুণের কথা, আর নিগুর্ণবাদীর কাছে নিগুর্ণের কথা। রামকৃষ্ণজীর ভাব যে, যে কোনরূপে বা যে কোন ভাবে ভগবদনুরাগী হ'লেই হোলো। যে, যে রকমে, ভাবে কি পথে যাক্‌ না কেন, সেই এক জনের কাছেই পঁহুছাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর এই সর্ব্ববাদী-সর্ব্বসম্মত, অসাম্প্রদায়িক, সার্ব্বভৌমিক, বিশ্বজনীন ভাবের মাধুর্য্যে তাঁর নিকটে, কি বিভিন্ন প্রকারের সাকারবাদী, কি যোগপথাবলম্বী, কি বৈদান্তিক, কি দরবেশ, কি খৃষ্টান সকলেরই সমাবেশ হ'তো। এই রসেভরা বসুন্ধরা যেমন যাবতীয় ফুল-ফল-প্রসবিনী গুল্ম লতা বৃক্ষরাজীর পুষ্টিকর উপাদান বহন করেন, আমাদের রামকৃষ্ণজীর শ্রীদেহেও ঠিক সেই রকম সকল মতের, পথের লোকের পুষ্টিসাধিকা শক্তিরস বহন করে। এই জন্যই রামকৃষ্ণজীর নাম বিবাদ-ভঞ্জন, জগদ্গুরু। রামকৃষ্ণজীর শরণাপন্ন যিনি হয়েছেন, তাঁরই অভীষ্টসিদ্ধ ও ইষ্টলাভ হয়েছে। যিনি অন্যরূপের দর্শনের জন্য রামকৃষ্ণজীর প্রদর্শিত পথে তাঁর সঙ্গে যান,

তিনি তখন রামকৃষ্ণজীকে বুঝ্‌তে বা চিন্‌তে পারেন না। পরে যখন রামকৃষ্ণজীর কৃপায় পূর্ণ-মনোরথ হন, তখন রামকৃষ্ণজীকে বুঝ্‌তে পারেন ও চিন্‌তে পারেন।

পা। কি বুঝেন, কি চিনেন?

ভ। এইটি বুঝেন, আর এইটি প্রত্যক্ষ দেখেন যে, যাঁর কাছে রামকৃষ্ণজী পঁহুছিয়ে দিলেন, তিনি যে বস্তু' আর রামকৃষ্ণজীও সেই বস্তু,' তবে আকার-ভেদে ও ভাব-ভেদে, আস্বাদনে একটুকু তফাৎ থাকে। আস্বাদনে প্রভেদ, ইহার অর্থ—ভাবে প্রভেদ; সে কেমন জান', কোথাও ভগবান্ বোধ থাকিবে, কোথাও ভগবান্ বোধ থাক্‌বে না। যেমন তোমার কৃষ্ণে সখ্য ভাব; তুমি কানাইকে পেলে কি প্রণাম করবে? না—তার পা-তলায় যোড়-হাত ক'রে বস্‌বে? তুমি যেমন তোমার ইয়ারের সঙ্গে ব্যবহার কর, একসঙ্গে খাও, একসঙ্গে বোসো ইত্যাদি, ঠিক তেমনি করবে; কিন্তু রামকৃষ্ণজীর উপর গুরু-ভাব অর্থাৎ ভগবান্-ভাব প্রবল থাক্‌বে। যদিও দুইই সেই এক বস্তু, বেশ বুঝ্‌তে পারবে, তথাপি আকারের, রূপের ও ভাবের পার্থক্য এই প্রভেদটুকু থাক্‌বে।

পা। সকল রূপেই কি সেই এক বস্তু, সেই এক ভগবান্? কালী, কৃষ্ণ, রাম, শিব, রাধা, সীতা ইত্যাদি এই সব যাবতীয় আকার ও রূপ কি সেই এক ভগবানের? আর সাকারেও যে বস্তু, নিরাকারেও সেই বস্তু?

ভ। তা নয় ত কি?

পা। তা যদি হয়, তবে এই যাবতীয় আকারে ও রূপে, সেই একমাত্র ভগবান্, কি প্রকারে বিবিধ ভক্তের বাসনা পূর্ণের জন্য চিরকাল সর্ব্বদাই এই সব বিবিধ রূপে বিদ্যমান আছেন? মনে করুন

আমাদের থিয়েটারে এক এক জনের দুটি তিনটি পার্ট থাকে। কোন পার্ট দেখাবার জন্য রাজার বেশ ধর্‌তে হয়; কোন পার্টে সহরকোটালের বেশ ধর্‌তে হয়, কোন পার্টে কয়েদীর বেশ ধর্‌তে হয়, কিন্তু এক স্থলেই যদি রাজা, সহরকোটাল ও কয়েদীর উপস্থিতির আবশ্যক হয়, তা হোলে কি এক জনের দ্বারায় ঐ তিনরূপ সম্ভব হোতে পারে? একজন বারে বারে নানা-রূপে বেশে আস্‌তে পারে; কিন্তু এককালীন একজনে কখনই একরূপ ভিন্ন অন্তরূপ দেখাতে পারে না।

ভ। আমি তোমার কথা বুঝেছি। এক ভগবান্ যদি নানা-রূপে আকারে সর্ব্বত্রে সমানভাবে সর্ব্বদা বিরাজমান থাক্‌তে অক্ষম হন, তা হোলে তিনি আর ভগবান্ কিসের? ভগবানের যে অনন্ত বিশেষণটি আছে, তার মানে কি জান'—তিনি অনন্ত এক রকমে নন, তিনি অনন্ত রকমে অনন্ত। ভগবানে সকল সম্ভব। ভগবান্ যে কি, তা ভগবান্ ব্যতীত কে জেনেছে বা জান্‌বে বা জানা সম্ভব। তুমি দু দশটি রূপের কথা বোল্‌ছো কি, আমি রামকৃষ্ণজীর কাছে সেই এক ভগবানের এক এক রূপেই অনন্তর কথা শুনেছি।

রামকৃষ্ণজী একদিন ভক্তমণ্ডলির মধ্যে অনন্তের আভাস দিবার জন্য বোল্‌ছেন,—সেখানে যেতে পথের দুধারে থোলো থোলো রাম, থোলো থোলো কৃষ্ণ ঝুল্‌ছে। এক এক কৃষ্ণের থোলোতে এত কৃষ্ণ আছে, এক এক রামের থোলোতে এত রাম আছে, যে গণনাতে অনন্ত; আবার ঐ সকল থোলোগুলিও গণনাতে অনন্ত। একটী থোলোর একটী কৃষ্ণ এসে বৃন্দাবনে লীলা ক'রেছিলেন। একটী থোলোর একটি রাম এসে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন

এক একটী মূর্ত্তি মূর্ত্তিতে অনন্ত হয়েও প্রত্যেকের মধ্যেই সে পূর্ণ-ব্রহ্মত্ব বিরাজমান। ভগবান্ একাধারেও যেমন অনন্ত, অনন্তাধারেও তেমনি অনন্ত। আমরা যেমন ক্ষুদ্র জীব, আমাদের আধারও তদনু-যায়ী ক্ষুদ্র, সে অনন্তের ভাব কেমন করে বুঝ্‌বো বল'?
সেই জন্য রামকৃষ্ণজী বোল্‌তেন, এক সের ঘটিতে কি পাঁচ সের দুধ ধরে।

শেষ কথা, যিনি সাকারে, তিনিই নিরাকারে। যাঁর সাকার, তাঁরই নিরাকার। সাকার নিরাকার, দুই তিনি। এই দুই ছাড়া আরও যা কিছু আছে, তাও তিনি। একটি বই তো আর দোস্‌রা জিনিস নাই; সুতরাং যতই রকমারির কথা শুনেছ', যত রকমারি দেখেছ' সব সেই তাঁর, সকলেই সেই তিনি। যিনি আধার, তিনিই আধেয়। যিনি অদ্বৈত, তিনিই দ্বৈত। দ্বৈতাদ্বৈত দুই সে একেরই খেলা।

যে ভাগ্যবান জীব ঠিক্ ঠিক্ দ্বৈতবাদী, তিনিই ঠিক্ ঠিক্ অদ্বৈতবাদী। প্রকৃত দ্বৈতবাদীতে ও প্রকৃত অদ্বৈতবাদীতে কোন প্রভেদ নাই। অনন্তের মধ্যে সেই একের খেলা, যিনি দেখ্‌তে পেরেছেন, তাঁরই ঠিক অদ্বৈত-জ্ঞান হ'য়েছে। বহুতে একের সত্তা এই বোধকে অদ্বৈতজ্ঞান বলে। এই জ্ঞানার্জ্জনে জীব শিবত্ব অবস্থা অর্থাৎ দেব-দুর্লভ অবস্থা প্রাপ্ত হয়; তাই রামকৃষ্ণজী বোল্‌তেন, "অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।"

"যা ইচ্ছা তাই কর," তার মানে, এবংবিধ অদ্বৈতজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্যক্তি যা তা করতে পারেন না, অর্থাৎ তিনি যা করেন, তা তাঁর ঠিক্ কার্য্য করা হয়, কেন না, তাঁর আর বেতালে পা পড়্‌বার যো নাই।

ভগবানের আশ্চর্য্য খেলা, সে খেলাও আবার অনন্ত; তুমি যত কালই খেলা দেখ' না কেন, সেই খেলা ক্রমাগতই অনন্ত বোলে পরিলক্ষিত হবে। সাগরের মধ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই যেমন সাগরের প্রকাণ্ডতা বৃদ্ধি হয়, তেমনি ভগবানের খেলা যতই দেখা যায়, ততই তাঁর খেলার আকার বাড়ে। খেলা রকমারিতেও যেমন অনন্ত, আকারেতেও তেমনি অনন্ত। অনন্ত জিনিসটি মানুষের মাথায় ধারণা হয় না। যিনি অনন্তের তিলের তিল তস্য তিলের আভাস পেয়েছেন, অর্থাৎ সেই প্রকাণ্ডতার বৃহত্বের কণার কণামাত্র আভাস পেয়েছেন, তিনি অনন্ত শব্দের, জোর অ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেই নির্ব্বাক্ ও আত্মহারা হন। এই আত্মহারা কেমন জান'?—শুঁড়ির দোকানে কত জালা জালা, পিপে পিপে মদ আছে, তার মধ্যে এক বোতল খেয়েই যেমন একজন বাহ্যহারা হয়; অনন্তের আভাসেও বাহ্যহারা তদ্রূপ।

পা। অবতার বা সাকারবাদে অনেক লোকে আপত্তি করেন ও বলেন, যিনি অনন্ত ও অখণ্ড, তিনি কখনও সান্ত বা খণ্ড হতে পারেন না; অতএব অবতারবাদে—কি কোন মূর্ত্তি-বিশেষে, সেই অনন্তের, অখণ্ডের আরোপ, এ কেবল মাত্র ভ্রান্তিমূলক।

ভ। যিনি এরূপ কথা বলেন, তাঁর মাথায় মোটেই অনন্তের ভাবের আভাস পর্য্যন্ত নাই; অনন্তের অর্থই তাঁর উপলব্ধি নাই। তিনি ভগবানে যে অনন্ত বিশেষণ ভূষায় ভূষিত করেন, এ কেবলমাত্র মুখে, প্রাণে প্রাণে নহে। আমার বক্তব্য, যিনি অনন্ত, তিনি সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাবস্থায় অনন্ত; আকারে অনন্ত, রূপে অনন্ত, ভাবে অনন্ত, রসে অনন্ত, গন্ধে অনন্ত, শব্দে অনন্ত, স্পর্শে অনন্ত। তিনি অখণ্ড ও খণ্ড এ দুইই। যিনি অনন্ত, তিনি

যে রূপেই বা যে সীমাবিশিষ্ট আকারেতেই পরিণত হউন না কেন, তাঁর অনন্তত্ব সকল অবস্থাতে বিদ্যমান থাকে। তিনি অনন্তেও যেমন অনন্ত, সীমাবিশিষ্ট খণ্ডেও সেই রকম অনন্ত। এর উপমা গঙ্গাজল; হিমালয় হ'তে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বহমানা আগোটা ভাগীরথীর জলে যে পাবনী মহিমা আছে, সেই পাবনী-মহিমা ভাগী-রথীর যেখানে হউক এক বিন্দুতেও বিদ্যমান। আকারে সীমাবদ্ধ হ'লেও তাঁহাতে ভগবানের অনন্তত্ব, অখণ্ডত্ব, সর্ব্বশক্তিমানত্বের ত্রুটি থাকে না। যে জগজ্জননী বিশ্ববাসিনী, তিনিই আবার বিন্দুবাসিনী; বিশ্ববাসিনী অবস্থাতেও তিনি যেমন, বিন্দুবাসিনী অবস্থাতেও ঠিক তেমনি। লীলাময়ী কখন দিগম্বরা, কখন সাম্বরা; সকল অবস্থা-তেই তিনি। তুমি থিয়েটারের অভিনেতা, যে সাজই ধর না কেন, তোমার তুমিত্ব সকল বেশেই সমান ভাবে থাকে। এ সকল প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা ভক্তের বা সাধকের উপলব্ধির কথা, পুস্তকপাঠীর কথার কথা নহে বা কূট বিচারের কথা নহে।

যিনি অনন্ত বা অখণ্ড, তিনি সান্ত বা খণ্ড হ'তে পারেন না, এ কথাটি বল্লেই, তাঁর অনন্তত্বে প্রতিবাদ করা হয়। অনন্ত যদি সান্ত হবার শক্তিহীন হ'লেন, তা হোলে তাঁর অনন্তত্ব কোথায় রৈল? তিনি কেবলমাত্র অনন্ত আর কিছু নন্, এইটী বল্লেই তাঁর অনন্তত্বে গণ্ডী দেওয়া হয়; সাকার উপাসকদের সাকার উপাসনা দ্বারা গণ্ডী দেওয়া হয় না।

রামপ্রসাদ—তাঁর গানে এক জায়গায় বোলেছেন,—

"রামপ্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে,
চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝ্ নারে মন ঠারে ঠোরে।"

তাঁর আর একটী গীত—

"কে জানে সে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রধারে যোগী যারে করে মনন,
পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।
আত্মারামের আত্মা কালী, রাম-প্রেয়সী সীতা যেমন,
কালী সর্ব্বঘটে বিরাজ করে ইচ্ছময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
প্রসবে ব্রহ্মাণ্ড অণ্ড প্রকাণ্ডতা বুঝ কেমন,
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না,
ধর্‌বে শশী হ'য়ে বামন।"

আর একটি গান—

"এই যত সব মাগীর খেলা,
মাগীর গুপ্তভাবে আপ্ত লীলা।
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ঢেলা দিয়া ভাঙ্গছে ঢেলা,
মাগী সকল কাজে সমান রাজি,
নারাজ খালি কাজের বেলা॥
রামপ্রসাদ বলে, থাক্‌রে বোসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা,
উজান এলে উজিয়ে যাবি, ভাটিয়ে যাবি ভাটার বেলা।"

রামপ্রসাদ যে কালীকে চৌদ্দপুয়া সসীম আকারে দেখেছিলেন, সেই কালীকেই ব্রহ্মময়ী দেখেছিলেন। জগৎপূজ্য যে ব্যাস পুরাণ প্রণেতা, তিনিই আবার বেদান্তের লেখক। ব্যাসবিরচিত বেদান্তের ভাষ্যকার শঙ্কর ও রামানুজ। জন্ম জন্ম সাধনসম্ভূত ভগবৎকৃপা ব্যতীত ব্যাস-প্রণীত গ্রন্থাদি জীবের কোন প্রকারেই ধারণা হয় না।

কোথাও কোন ব্যক্তির বিষয়ে, কোন মত.মত প্রকাশ কর্‌বার

পূর্ব্বে যেমন তাঁর বিশেষ পরিচয় অবগত হওয়া প্রয়োজন, তদ্রূপ ঈশ্বরতত্ত্ব সাধারণের মধ্যে বল্‌বার পূর্ব্বে ঈশ্বর-লাভ হওয়া চাই। জীবের ঈশ্বর-লাভ হ'লে কেও কেও আর কথা কইতে পারেন না, কেও বা সৎবিষয় আন্দোলন দ্বারা যতদিন বাঁচেন, সেই কয়েকদিন সদালাপে অতিবাহিত করেন। ঈশ্বর দর্শন, ঈশ্বর-লাভ ও ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতীত ঈশ্বর বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশের অধিকারী কেহ হ'তে পারেন না। যাঁরা সাকার উপাসনার প্রতিবাদী, তাঁরা কোন ভাবেরই উপাসক বা সাধক নন। যে কোন ভাবেই হউক, ঠিক ঠিক উপাসক যিনি, তিনি কোন উপাসকের নিন্দা কর্‌তে পারেন না; তার কারণ, তিনি বেশ জানেন ও বুঝেন যে, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ও পদ্ধতিতে সেই একেরই উপাসনা কচ্ছেন। দ্বিতীয় কারণ, যিনি ঠিক্ ঠিক্ উপাসক, তিনি একমনে আপনার ভাবেই মত্ত থাকেন, অন্যদিকে লক্ষ্য কর্‌বার অবকাশ পান না। সাগরের তীরেই যত শব্দ, সাগরের ভিতরে প্রবেশ কর্‌লে আর শব্দ থাকে না, ঠিক্ তেমনি ঈশ্বর-পথের বহির্ভূতেই যাবতীয় কোলাহল; সেখানে প্রবেশ কর্‌লে আর গোলমাল থাকে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর মতে সাকার উপাসনার প্রতিবাদ করা, ঘোর অজ্ঞানের কাজ। ঈশ্বর-পন্থীদের পরস্পর বিবাদ-ভঞ্জন কর্‌বার জন্য, ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর অবতারণা; এটি তাঁর লীলার প্রতি ছত্রে ও প্রতি অক্ষরে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

কূট তর্কবুদ্ধি কি কূট বিচারবুদ্ধি দ্বারা ভগবানের সাকারবাদের প্রতিপাদ করা নিষ্প্রয়োজন। এই কূটবুদ্ধির অন্য নাম ঘোর সন্দেহ। সরল-মতি ব্যক্তিদের এরূপ সন্দেহ ঘট্‌লে গুরুপদে আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়ঃ। গুরু-বাক্যে নিষ্ঠাই এবংবিধ সন্দেহরূপ বিষবৃক্ষের কুঠার-

স্বরূপ। শ্রীগুরুপদাম্বুরক্ত পূর্ণ-মনোরথ ভক্তিমানেরা এই সন্দেহকে ভবব্যাধি বলেন। অনেকে আবার বলেন, এই সন্দেহই সেই ভীষণ তমস্, যাতে ভগবানকে জীবের চক্ষু থেকে একবারে আড়াল ক'রে রাখে। যে হৃদয়-মুকুরে ভগবানের রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, সেই মুকুরখানিকে এই সন্দেহ মলিন ক'রে রাখে। সদ্গুরু সংসর্গে ও তাঁর কৃপায় সূর্য্যোদয়ে আঁধারের ন্যায় তমস্ দূরীভূত হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর কাছে এটি আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।

কত দেশ-বিদেশ থেকে ঠাকুরের কাছে সময়ে সময়ে কত দিগ্বিজয়ী বড় বড় শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা আস্তেন। প্রথমতঃ তাঁরা ঠাকুরের সঙ্গে বিদ্যাভিমানে মত্ত হয়ে ভয়ঙ্কর বাক্যচ্ছটা সহকারে ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিষয়ে এমন তর্ক-বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেন ও ঠাকুরকে এমন অবস্থাপন্ন ক'রে ফেল্‌তেন যে, তিনি আর কি বোল্‌বেন, তার পথ পেতেন না। লোকে বুঝ্‌তো, ঠাকুর পরাজয় হলেন। এমন সময় ঠাকুর কি করতেন জান'? তিনি বোল্‌তেন, আমি মল কি মূত্র ত্যাগে যাব'। একবার যাব' বোল্লে আর থাক্‌বার যো নাই যেমনি বলা, তেমনি উঠা। ভক্তেরা প্রভুর ধারা অনেক বুঝেন; ঠাকুরকে উঠ্‌তে দেখে' অমনি একজন জলপাত্র নিয়ে ঠাকুরের পেছু পেছু চল্লেন।

পা। ঠাকুর পরাজয় হলেন এ কেমন কথা?

ভ। তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? আগে সবটুকু শুন'। ঠাকুরের পরাজয়ের খুব কারণ আছে। বিদ্যাভিমানীদের বাসনাই বিচারে জয়লাভে প্রশংসিত হবেন এবং তাঁদের অধ্যয়নের উদ্দেশ্যই তাই। ঠাকুরের ঢোলপেটা নাম শুনে, তাঁর কাছে ঐ বাসনাতেই এসেছেন; ঠাকুর কল্পতরু; যার যা বাসনা, তাই তিনি পূর্ণ করেন।

অমানীকে অভিমান দিতে ঠাকুরের মত এমন দাতা কোথাও শুনি নাই।

তার পরে ঠাকুরের পথে যেতে যেতেই ভাবাবেশ; চল্‌ছেন ঠিক মাতালের মত, আবার শ্রীমুখে বিড়্ বিড়্ ক'রে কত কি বোল্‌তেন, কখন কিছু বুঝা যেত, কখন কিছু বুঝা যেত না। এই ভাবে যথাস্থানে একবারমাত্র বসেই দ্রুতপদে ফিরে আস্‌তেন, আর সেই তার্কিককে ছুঁয়ে দিয়ে বোল্‌তেন, কৈ আপনি কি বোল্‌ছিলে, বল', দেখি। এই ছুঁয়ে দেওয়াটিই করুণানিধির অপার করুণা। প্রভুদেবের স্পর্শে তার্কিক পণ্ডিতেরা কেমন এক রকম হ'য়ে যেতেন—সেটা কেমন জান'? সর্পবিদ্যাবিদ সাপুড়ে, জড়ি হাতে ক'রে উন্নত-ফণা সাপকে ধর্‌লে, সাপটি যেমন হয়, পণ্ডিতদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হোতো। এখন আর সে আগেকার চক্রধরা ভাব নাই, লম্বা চওড়া শ্লোক আউড়ে ফোঁশ-ফোঁশানি নাই—সেই বিস্তৃত-ফণা ভুজঙ্গম, এখন যেমন কুঁচে। এই ভাবে কিছুক্ষণ ঠাকুরের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাক্‌তেন; তার পরেই, কেও বা হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে ঠাকুরকে স্তব স্তুতি কর্‌তেন, কেও বা বোল্‌তেন—"দেহি মে চৈতন্যম্", আবার কেও বা কেবল ঠাকুরের পা-তলে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে মাটি ভিজাতেন।

এইখানে আমার একটি কথা আছে। কথাটী—সকল বিষয়েরই ছবি আছে; যে ঘটনাটী কথায় শুন্‌লে, তার ছবিটি একবার চোখ্ মুদে দেখ' দেখি। এই ছবিটী যদি তুমি দেখ্‌তে পাও, তা হ'লে তৎক্ষণাৎ বুঝ্‌বে যে, ঠাকুরের কৃপায় কেমন চকিতের মধ্যে মহা-বিরোধিনী ভয়ঙ্করী অবিদ্যা মায়ার তমস্ আবরণ দূরীভূত হ'তো। জন্ম জন্ম কঠোর তপস্যাতেও যে বস্তু জীবের লাভ হয় না, প্রভু

দেবের দর্শনে ও স্পর্শে অপেক্ষাকৃত অধিক দুর্লভ বস্তু লাভ হতো। ঠাকুরের করুণার সীমা নাই। সন্দেহ-আঁধারের জন্যই পণ্ডিতেরা কিছু পূর্ব্বে অহঙ্কারজনিত বিদ্যাভিমানে উন্নত মস্তক ছিলেন; প্রভু দেবের স্পর্শেই সেই মস্তক ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত; এর অর্থ—তর্কাবস্থায় যে তত্ত্ব তার্কিকদের চক্ষের অপ্রত্যক্ষীভূত ছিল, ঠাকুরের স্পর্শশক্তিতে সেই তত্ত্ব দিনালোকে বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত হোলো। দয়ানিধি কল্পতরু ভগবান্ চৈতন্যদানে তমস্ দূর করে দিয়ে সত্য তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করবার শক্তি দিলেন।

আর এক কথা, এই সন্দেহই জগতের যাবতীয় জীবকে তৈলকার যন্ত্রে আবদ্ধ-চক্ষু বৃষের ন্যায় সংসার-কর্ম্মক্ষেত্রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সাধনার পথেও এই তিমির তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু সেটি জন্ম জন্ম কঠোর সাধনার ফল। আর এ দিকে রামকৃষ্ণজীর মহিমা দেখ'। সাধনার পথে তমস্ নষ্ট আর প্রভুর কৃপায় তমস্ নষ্ট, এ দুয়ে তফাৎ কত জান'? যেমন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা পদব্রজে বৃন্দাবন গমন আর আহারীয় দ্রব্যাদি সহ টিকিট লাভে রেলপথে বৃন্দাবন গমন। দ্বিতীয় উপমা, কূপ খনন দ্বারা জলপান ও স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীতে জলপান। যাঁর স্পর্শমাত্র জীবের চৈতন্যোদয় হয়, তিনি কি বস্তু, এ কি জীবের প্রণিধানে আসে? ভাই, একবার মন প্রাণ খুলে জয় রামকৃষ্ণ বল'। জীব অধীতশাস্ত্র হলেও, বিনা চৈতন্যে সে পশুর কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণী মাত্র। অচৈতন্যে চৈতন্য সঞ্চার, আর পাষাণে প্রাণ সঞ্চার, এ দুয়ে কিছুই তফাৎ নাই। রামরূপে প্রভু একটী মাত্র পাষাণীকে মানবীনী করেছিলেন; এবারে রামকৃষ্ণরূপে অপার দয়ার ভরে শত শত পাষাণ-হৃদয়কে সচেতন ক'রে অপার মহিমা দেখালেন। চৈতন্য হ'লে জীবের কি

প্রকার অবস্থান্তর হয়, তা মুখে বলা যায় না; সেই জন্য তোমাকে বার বার বলেছি, রামকৃষ্ণলীলা বল্‌বার নয়, শুন্‌বার নয়, কেবল-মাত্র দেখ্‌বার।

পা। চৈতন্য হ'লে, কি রকম হয়, তবু যত টুকু পারেন বলুন না?

ভ। চৈতন্য লাভ ও মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ, একই কথা। দেখ' যে কখন থিয়েটার দেখে নাই, পাড়াগেঁয়ে চাষা-ভূষা লোক, সে যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, হেঁ মশায়! থিয়েটারে কি দেখান্ কি আছে?—তা হ'লে তুমি তাকে কি বোল্‌বে বা কি বোঝাবে? এখানে তদ্রূপ—এই সৃষ্টি, মায়ের রঙ্গালয়। এই জগতের মধ্যে আর এক জগৎ আছে। এই জগতের নাম বাহ্য-জগৎ, আর ভিতরে যে জগৎ আছে, তার নাম অন্তর্জগৎ। বাহ্য-জগত অন্ত-র্জগতের সূচীপত্রস্বরূপ। মা-রঙ্গময়ী—এই জগতদ্বয়ে যে রঙ্গ কর্‌-ছেন, তার নাম অবাক্ রঙ্গ। টিকিট কি ফ্রি পাশ যেমন তোমা-দের থিয়েটারে প্রবেশের উপায়, বাহ্য-জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশে মায়ের প্রসন্নতা বা চৈতন্য একমাত্র উপায়। চৈতন্য হ'লে এই বাহ্যজগতকে আবার আর একরকম দেখ্‌বে; যদিও অচৈতন্যা-বস্থার বাহ্য-জগত আর চৈতন্যাবস্থার বাহ্যজগৎ, সেই একই, তবু চৈতন্যাবস্থায় দেখ্‌বে যে, তার পূর্ব্বেকার প্রকৃতি, চেহারা বর্ণ এক-দম্ অন্য রকমের হয়ে গেছে। সচৈতন্যে চোখ্ চেয়ে দেখা নয়,—চোখ্ মুদে দেখা। আলোয় আঁধারে সমান দেখা যায়। চামড়ার চোখ্ দুটী তখন নামেমাত্র চক্ষু, দেখ্‌বার বেলা আর এক চোখের আবশ্যক। সেই চোখে অবাক্ রঙ্গ দেখা যায়। অবাক্ রঙ্গের দু একটী খেলা বলি শুন',—তুমি একটী চৌদ্দপুয়া পরিমিত অস্থি-

চর্ম্মে গড়া মানুষ মাত্র। তুমি জান' যে, এই দেহটিই আমি; কিন্তু তা নয়—তুমি দেহ ছাড়া অর্থাৎ দেহতে তোমাতে আলাদা। এই দেহের ভিতরে একটা মন রয়েছে; ঐ মন দিবানিশি সংকল্প বিকল্প কর্‌ছে। ঐ একটী মন, কথন কথন দুটী হ'য়ে পরস্পর ঝগড়া করে; আবার সেই ঝগড়া নিস্পত্তির জন্য অন্য একজন বিবাদ-ক্ষেত্রে উদয় হয়; এ সওয়ায় চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, জীবাত্মা, পরমাত্মা, কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপু এই দেহে রয়েছে ও কাজ কর্‌ছে; এই সকল যাবতীয় তত্ত্ব বহু পূর্ব্বে তোমাকে বলেছি। এই সব অবাক্-রঙ্গ; দিবানিশি দেহে রয়েছে, কত কি খেলা কর্‌ছে, মানুষ কিন্তু কিছুই টের পায় না।

এ সওয়ায় আরও কত অকথ্য বস্তু দেহের মধ্যে রয়েছে—তুমি কি তাদের বিষয় কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছো—না—তাদিকে দেখ্‌তে পাও? পুঁতুলওয়ালা যেমন নানা কলে কৌশলে পুঁতুলগুলিকে নাচায়, মা-রঙ্গময়ী জীবের দেহের মধ্যে সাতসতেরগণ্ডা জিনিস দিয়ে নিজের ইচ্ছামত সকল দেহীকেই খেলাচ্ছেন। দেহীদের ভিতর দিয়ে তিনি সৃষ্টির সকল খেলা খেলিয়ে নেন্; তারিপ এইটী যে তাঁর রঙ্গ-কৌশলে দেহীদিগে তার কিছুই জান্‌তে দেন না—তবে যে আধারে মা প্রসন্ন হ'য়ে চৈতন্য দেন, সেই আধার এই সকল খেলা দেখ্‌তে পায়।

অবাক্ রঙ্গ—এই সৃষ্টিতে প্রত্যেক দেহে এক একটী "আমি" রয়েছে এবং প্রত্যেকেই অহংকারে 'আমি আমি' রবে গগন ফাটাচ্ছে, কিন্তু সত্যতঃ "আমি" ব'লে এত লক্ষ কোটি আমি নাই। আমিদের স্থলে যিনি আছেন, মায়ের বিনা প্রসন্নতা লাভে তাঁকে দেখ্‌বার উপায় নাই।

লোকে বলে—তার অনেক পরিচিত লোক আছে অর্থাৎ সে তা-দিগে চিনে, কিন্তু বাস্তবিক, সে কাকেও চিনে না, বা জানে না, এমন কি, সে তার মা, স্ত্রী, পুত্র, পরিবারদিগেও চিনে না—সে নিজেকেও নিজে চিনে না। সে—কি, কোথা হ'তে এসেছে, কোথা রয়েছে, কোথা যাবে, কি কর্‌বে, এ সকল কিছুই জানে না। মা-রঙ্গময়ীর প্রসন্নতা-প্রসূত চৈতন্য বিনা, কিছুই চিন্‌বার বা জান্‌বার উপায় নাই।

জীবজগতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের যে লক্ষকোটি রকমারি দেখ্‌ছো, এই সব রকমারিই এক পাকের ভিয়ানে উৎপন্ন। এদের মধ্যে ছোট বড় নাই, ভাল মন্দ নাই, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নাই। বিশাল্ সৃষ্টির মধ্যেও যা আছে, এক একটি দেহাধারেও সেই সব আছে। রূপান্তর গুণান্তর বই কাহারও নাশ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি চৈতন্যবান্ বিনা আর কেও দেখ্‌তে পায় না।

এখন বুঝ'—চৈতন্য কি। এই দেব-দুর্লভ চৈতন্য রামকৃষ্ণজীর ঈষৎ করুণকটাক্ষে জীবের দেহে সমুদিত হ'তো। চৈতন্যই ভব-সাগর উত্তীর্ণ হবার একমাত্র তরণী এবং তায় রামকৃষ্ণজীই একমাত্র কর্ণধার।

ঠাকুর অন্ধ জীবকে তাঁর এই অপার করুণার ও মহাশক্তির পরিচয় দিবার জন্যে সময়ে সময়ে ভাবাবেশে বোল্‌তেন—জাত সাপ ধর্‌লে, বড় বেশী ডাক্‌তে হয় না—একবার কি দুবার, জোর—না হয় তিনবার—এর মানে কি জান'? কতকগুলি সাপের মুখে কালকূট বিষ থাকে, তাদিগে জাত সাপ বলে, যেমন গোখ্‌রা, কেউটে, কালিয়ানাগ ইত্যাদি; আর কতকগুলির বিষ নাই, যেমন—মেটেলি, ঢোড়া ইত্যাদি। নির্বিষেরা যদি ব্যাঙ ধরে, তা

হোলে ব্যাঙকে অনেকক্ষণ কেঁও কেঁও ক'রে ডাক্‌তে হয়; কিন্তু যদি বিষধরে ধরে, তা হোলে বেশী ডাক্‌তে হয় না, কেন না বিষের জোরে শীঘ্রই জেরে ফেলে।

এই উপমায় ঠাকুর নিজের পরিচয় দিয়ে, এই বোল্‌তেন যে, আমি এমন জাতির—যাকে ছোঁব, তাকে বড় বেশী তর্ক-বিতর্ক কর্‌তে হবে না, শীঘ্রই তার কাজ মিটবে।

ঠাকুর আবার কখন কখন বোল্‌তেন—তেলাপোকায় আরশুলা ধর্‌লে আরশুলার বর্ণটা ঠিক্ তেলাপোকার গায়ের বর্ণের মত হ'য়ে যায়—এর মানে, আমি (ঠাকুর) যাকে ধর্‌বো, আমার মত তার বর্ণ হবে। গিরিশ বাবুকে বোলেছিলেন, এই বেলা খেয়ে, মেখে ও ভোগ কোরে নে; এর পরে আর হবে না।

ঠাকুরের অনেকগুলি ধনী, মানী, গুণীভক্তও প্রথমতঃ অর্থাৎ ঠাকুরকে দর্শন কর্‌বার পূর্ব্বে, কেবলমাত্র নাম শুনে বলেছিলেন—এই বয়সে কত হংস দেখ্‌লাম—যদি যাই, নাকও—মোলে দিয়ে আস্‌বো; কেও বলেছিলেন, দু কথায় থ বনিয়ে দিয়ে আস্‌বো, গিরিশ বাবুও প্রথম দর্শনে বোলেছিলেন, এই উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বুজ্‌রুকি দেখ্‌লাম—কিন্তু প্রভুর কেমন মোহিনী এক্‌বার কি দুবার তাঁর সরল-বালক-সুলভ-স্বভাব ও পরমানন্দময় মূর্ত্তি দর্শনে, অভিমানী ভক্তেরা এ জন্মের মত শ্রীশ্রীপদে বিকিয়ে গেলেন, তাঁদের পূর্ব্বেকার যুক্তি, তর্ক, বিচার, বুদ্ধি অভিমানাদি রামকৃষ্ণরূপ-সাগরে কোথায় তলিয়ে গেল, তার আর খোঁজ খবর মাত্র পেলেন না। ঠাকুর পরম রূপবান্—দেখ্‌লে আর বাঁচাও নাই। এমন অরূপে রূপের ছবি সৃষ্টিতে কেও কখন দেখেন নাই। কেবল রূপেই যে মোহন—তা নয়—গুণেও তেমনি মোহন। অতি

সুন্দর বাঁকা বাঁকা চোখ্ দুটি, কাণ পর্য্যন্ত টানা। তাতে আবার এমন মোহনত্ব যে, সেই চোখে কারু পানে তাকালে তার আর রক্ষা নাই।

মনপাখী দিয়া ফাঁকি পলাতে না পারে।
অনিবার্য্য শরাঘাত সন্ধানিলে কারে॥
ধনুশরে মারে, আঁখি-শরে দেয় প্রাণ।
আঁকিতে নারিনু বাঁকা আঁখির সন্ধান॥
(রামকৃষ্ণপুঁথি)

প্রশস্ত ললাট, ঈষৎ রক্তিম কুঁদেকাটা ঠোঁট দুটি; নিরুপম মুখখানি, ধীর মন্দ সমীরণে আন্দোলিত কালিন্দীর স্বচ্ছসলিলের ন্যায় মৃদু হাসিতে ঢল ঢল; যেন তায় চাঁদের কিরণ মাখা, পরিমিত গ্রীবা, কণ্ঠে মুরলীর স্বর, বিশাল বক্ষঃস্থল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, শোভমান পা দুটি, কমলাদপি কোমল চরণতল, স্পর্শে লৌহদেহ কাঞ্চনময় হয়। যাবতীয় পূর্ণগুণে শ্রীঅঙ্গ পরিপূরিত। তার মধ্যে দয়াই যেন ষোল-আনার অধিক; বিতরণও মুক্ত হস্তে; তিলবৎ স্থলে তালবৎ দান, তাতেই দর্শকবৃন্দ বিভোর; সুতরাং শ্রীআধারে কত কি আছে, তা দেখ্‌বার কেহ অবকাশ পান নাই। লীলা অতি গভীর, নিজে পাতালও তলা পান না। বাহ্যৈশ্বর্য্য থেকেও কিছুমাত্র নাই; অন্তরৈশ্বর্য্যে কিন্তু কোটি কোটি বিশ্বও ডলিয়া যায়, সেইজন্য রামকৃষ্ণলীলা মুখে বলা যায় না। এ লীলা শুন্‌বার নয়, কেবল দেখ্‌বার। যা দেখা যায়, তা কথায় প্রকাশ হবার নয়। ঠাকুর যেমন গুপ্তাবতার, লীলা খানিও তদ্রূপ। অদ্ভুত খেলা। মহাব্যক্ত হ'য়ে মহাগুপ্ত। অতি-সরলকে বুঝা—মহাদায়। অতি সরলে যেন অতি বাঁকার ভাব, ঠিক তেমি ব্যক্তা-

বতারে গুপ্তাবতারের ভাব। বস্তু প্রত্যক্ষ না হোলে, এক বস্তুতে বিপরীত ভাবের খেলা বুঝ্‌বার নয়।

পা। ঠিক বটে মশায়, এখানকার কথাগুলি শুন্‌তে বেশ লাগ্‌ছে, কিন্তু কিছু বুঝা যাচ্ছে না। বাহ্যৈশ্বর্য্য অন্তরৈশ্বর্য্য কি রকম? ব্যক্ত হয়ে গুপ্ত; সরল বা সোজা হোয়ে বাঁকা, এই বা কি প্রকার?

ভ। ঈশ্বরের লীলাতত্ত্ব এত খুলে বলা যায় না; ইঙ্গিত-ইসারায় বুঝে নিতে হয়। চোখে, নাকে, বদন-ভঙ্গিমাতে যেমন বল্‌তে পারে, বচনে তেমন পারে না। আমি বরাবরই তোমাকে ব'লে আস্‌ছি—আমি মূর্খ মানুষ, ভাষা-জ্ঞান নাই, শাস্ত্র-পাঠ নাই, তীর্থ-পর্য্যটন নাই, সাধন-ভজন নাই, আমার বল, বুদ্ধি, সহায়, সম্বল সকল রামকৃষ্ণজী; তিনি যেমন দেখাচ্ছেন, উপলব্ধি করাচ্ছেন, সেই গুলিই যেমন ক'রে হোক কুঁকিয়ে কাঁকিয়ে তোমাকে বল্‌ছি এইমাত্র। বাহ্যৈশ্বর্য্য কাকে বলি জান'? যে ঐশ্বর্য্যের বলে পাষাণখানা মানুষ হোয়ে গেল, কাঠের নৌকাটা সোনা হয়ে গেল, ভীষণ হরধনুখানা বালকের হাতে দুখানা হয়ে গেল, ভয়ঙ্করা তাড়কার নিপাত হ'লো, জলের উপর গুরুভার পাষাণ ভাস্‌তে লাগ্‌লো, কোড়ে আঙ্গুলের উপর পর্ব্বতটা তুলে ধরা হ'লো, দুগ্ধপোষ্য শিশুর দ্বারা রাক্ষসী প্রাণ হারালো, বাঁশীর গানে যমুনার জল উজান বৈল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কৃষ্ণ কালী হ'লো, চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখের ধাঁদা উঠ্‌লো, হাতে মাথা কাটা গেল, তিন পায়ে ত্রিভুবন ঢাকা পড়্‌লো, দাঁতে ধরণীর ভার সৈল ইত্যাদি ইত্যাদি—এই বাহ্যৈশ্বর্য্যের খেলা; এ খেলা রামকৃষ্ণ-লীলার বিষয়ীভূত হয়েও বিষয়ীভূত নয়। এখানে শুদ্ধ-সত্ত্বের খেলা—যার বলে এক

কথায় অন্তরের চির-ঘুমন্ত সাপ জেগে উঠ্‌লো, অবাক্‌-রঙ্গালয়ের দুয়ার খোলা পড়্‌লো, চির-আসক্তির জিনিসে অনাসক্তি হলো, আপনার যারা পর হ'লো ও পর যার, আপনার হ'লো; মনের গতি, বর্ণ ফিরে গেল, কোটি কোটি জন্মের পথ এক নিমিষের মধ্যে ফুরিয়ে গেল, ইন্দ্রিয়দের নূতন খোরাক জুট্‌লো, জগৎ নূতন হলো, দেহে আত্মায় পৃথক হলো, হাড়গোড়গুলো চলে বেড়ালো, বেদ-পুরাণের ভাব অন্তরে আপনি ফুট্‌লো, অনন্ত কোটি জিনিস একটা হয়ে দাঁড়ালো, একটা জিনিস অনন্ত রূপে, বর্ণে, গন্ধে, রসে ও শব্দে অনন্তে পরিণত হলো, ভাল মন্দ এক বিছানায় শুয়ে ঘুমুলো, আর যে ভগবানের দুয়ার প্রবেশে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম ইত্যাদি ভয়ে কম্পমান, সেই ভগবান্ আপনার চেয়েও আপনার হ'লো—এই সব রামকৃষ্ণজীর খেলার অন্তর্গত। বাহ্যৈশ্বর্য্যের কাণ্ড ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাধীন, তাই মুখে বলা চলে, কিন্তু অন্তরৈশ্বর্য্যের কাণ্ড ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়েও তাদের বিষয়ীভূত নয়, এই জন্য বর্ণনা করা যায় না, এই হেতু আমি ক্রমাগত বার বার বোল্‌ছি, রামকৃষ্ণলীলা বল্‌বার নয়, কেবল দেখ্‌বার। রামকৃষ্ণলীলা, যে তিলের তিল বুঝেছে, তার আর মুখে কথা বেরয় কি? মনে করে—এ যে অবাক রঙ্গ—এ কি মুখে বলা যায়—না—কাকেও বুঝান' যায়।

দ্বিতীয় কথা, রামকৃষ্ণজী ব্যক্ত হয়ে গুপ্ত আর অতি সরল, সোজা হোয়ে ও অতি বাঁকা—সে কেমন ধারা, ধীর স্থিরচিত্তে শুন'—রামকৃষ্ণজীর জন্মস্থান হলো এমন একটী স্থানে, যে স্থানটি তাঁর জন্মাবার পূর্ব্বে জন-সাধারণে পরিচিত হবার কোন কারণই নাই। যেখানে তাঁর পিতৃদেবের আবাসবাটি অর্থাৎ যে পুণ্য বাস্তুতে প্রভুদেবের

জন্ম হোলো, তাই কোন্ সেটি গ্রামের ভদ্রপল্লীর মধ্যে! স্থানটি গ্রামের এক প্রান্তভাগে—প্রতিবাসী জোলা-তাঁতি, আর ডোম, হিন্দুতে যাদিগে হীনজাতি বা ইতরজাতি বলে। অদূরে শ্মশান, আবিল ভাঙ্গা, নানাজাতি গাছ-পাতায় পরিপূর্ণ, মৃত-দেহ-লোলুপ শকুনি, কুকুর ও শিয়ালের নৃত্য-ভূমি, নিকটে একটি খাল, সন্ধ্যার পর একলা যাওয়া যায় না। পিতৃদেব তাই কোন্ একজন সম্পত্তি-বান্, সম্পত্তির মধ্যে সাতপুয়া জমি, গরিবের একশেষ; কিন্তু বুঝে যেও দৈন্য নন। ভিটার মধ্যে একখানি আবাস-বাটি, অর্থাভাবে কাঠের বদলে বাঁশের সাজ, কুঁড়ে ঘরের মত একখানি ঠাকুর ঘর, একখানি রন্থইঘর আর একটি ঢেঁকিশালা। স্থনাভাবে প্রভুদেব ভূমিষ্ঠ হলেন ঢেঁকিশালে। জন্মের পর পালন কর্লেন একটি কামা-রের ঘরের দুঃখিনী কড়ে রাঁড়ী। নিকটে সম্পত্তিবান্ লোকের বাস আছে বটে, তাঁরাও বহুপরিবার, ঘরে ছেলে-পুলেও অনেকগুলি, রামকৃষ্ণজী কিছু বড় হলে পর, তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে তত না মিশে, মিশ্লেন কি না অতি দুঃখী, দীন খেটে-খেকো লোকের ছেলে দের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে সর্ব্বদা সহবাস, তাদের সঙ্গে খেলা, তাদের সঙ্গে গরু চরাতে যাওয়া। লেখাপড়া শিখ্বার নামটী মাত্র নাই। বেশী বয়সে কর্ত্তৃপক্ষের জেদে পাঠশালে গেলেন, কিন্তু লেখাপড়ায় মোটে মন নাই। অনেক কষ্টে বিদ্যা হলো কাঠাকে পর্য্যন্ত। কিছু কিছু বর্ণপরিচয় হলো, তালপাতায় ঠাকুরদের নাম লিখ্তে শিখ্লেন। এইখানে বিদ্যার খতম্। পূর্ণ বালক বয়সে এবং যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরবাড়ীর পূজারীর চাকরিতে নিযুক্ত হলেন, —তাই কোন্ একটী সজ্জাতির ঠাকুরবাড়ী, ঠাকুরবাড়ী কি না, কৈবর্ত্তের, তাও আবার চাষী-কৈবর্ত্ত নয়, জেলে কৈবর্ত্ত! যেখানে

এই ঠাকুরবাড়ী, সেখানের কোন সজ্জাতিই প্রকাশ্যে এই ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ গ্রহণ করেন না। ঠাকুরবাড়ীর অধিকারিণী খ্যাত নামা রাণী রাসমণি; তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবী মা-ভবতারিণীর ও রাধাকান্তের বিপুল আয়োজন সহ নিত্য ভোগরাগের ব্যবস্থা। শুনেছি, প্রার্থী অভাবে মহাপ্রসাদ গঙ্গায় ফেলে দিতে হতো। কৈবর্ত্তের ঠাকুরের প্রসাদ ব'লে ভাল লোকে গ্রহণ কর্‌তো না। রামকৃষ্ণজী এই ঠাকুরবাড়ীর পূজারীর কাজে নিযুক্ত। রামকৃষ্ণজী ঠাকুরদের সেবায় অন্যান্য পূজারীদের মত বৈধ আচার কি কাজ রাখ্‌তে পার্‌লেন না। তিনি মহাপ্রেমে দেব-দেবীর সেবা পূজা ও বেশ করে দিতেন। সাধারণ জীবের প্রকৃতিতে আর রামকৃষ্ণজীর প্রকৃতিতে একেবারে বিপরীত সুতরাং বিধি-বাদীয়দের চক্ষে তিনি পাগল ব'লে সাব্যস্ত হলেন। তার পর তাঁর বড় ভাই রামকুমার ঠাকুর দেশে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের বিয়ে দিলেন। যাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো, তিনি আবার একজন দশকর্ম্মান্বিত যজমেনে ব্রাহ্মণ। খুব গরীব, পাঁচটা ছয়টা পোষ্য, কষ্টে দিন কাটান্। দেশের চলনানুসারে ঠাকুরকে বিয়ে কর্‌তে হোলো পণ দিয়ে, তাও বড় কম নয়, পূরাপূরি তিন-শ। ঠাকুরের স্বভাব ঠিক একটি ছেলে-মানুষের স্বভাবের মত। সত্ব, রজ, তম এ তিনের কোন গন্ধ নাই—আপন পর বিচার নাই, সম্পর্ক-বিচারের ধার ধারেন না, কামিনী-কাঞ্চনে মোটে মন নাই, যেখানে এ সম্বন্ধ, সেখানে ঘোর ঘৃণা, তার উপর মাঝে মাঝে ভাবাবেশ। পরিধেয়—কখন কোমরে, কখন বগলে, সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বত্রই মোহন কণ্ঠে ভগবৎলীলাগুণগীত। আচারে ব্যাভারে মানুষের সঙ্গে একবারে বিপরীত। কাজেই এখানেও

শশুর-বাড়ীর লোকেরাও পাগল ব'লে ঠাওরালেন। তার পর কলিকাতায় এলেন। নিজের নিয়মিত কাজ, মা-ভবতারিণীর সেবা দিন দিন কর্‌তে কর্‌তে রামকৃষ্ণজীর অন্তরে প্রবল ঝড় উঠে পড়্‌লো। অতি কঠিন কঠিন সাধন-ভজন আরম্ভ হলো, অধিকাংশই গোপনে; কখন কখন মানুষের চক্ষে পড়্‌তেন। সাধন-ভজনে অমানুষিক আচার, কখন বালকবৎ; কখন পিশাচবৎ কখনও উন্মাদবৎ। এই সব কেমন জান'—হয়তো রামকৃষ্ণজী মা-ভবতারিণীর খাটে শুয়ে আছেন, কখন গাছে উঠে মুত্রত্যাগ কর্‌ছেন, কখন ঘৃণাবিবর্জ্জিত অবস্থাপন্ন; বিষ্ঠা-চন্দনে সমান জ্ঞান ও তৎবৎ আচরণ। এই সকল দে'খে শুনে নিম্ন শ্রেণীর লোক থেকে মায় শাস্ত্রবিদ্‌-পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত ঠাকুরকে ঘোর উন্মাদ ব'লে পাকা জ্ঞান কর্‌লেন। সাধন-ভজন সমাধার পর যখন প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন জীবকে জ্ঞান, ভক্তি, চৈতন্য ও ঈশ্বরতত্ব বিলাবার জন্য ব্যাকুল হলেন। জীবের এখানে কামিনী-কাঞ্চনে, বিদ্যামদে, মানে, যশে ঘোর আসক্তি; কেও রামকৃষ্ণজীর পশরার জিনিস্ চায় না; সুতরাং তাঁর কথায় কেও কর্ণপাতও করে না। ঠাকুর তখন লোকের দ্বারে দ্বারে খরিদদার যুটাবার জন্য যেতে আরম্ভ কর্‌লেন। কোথা কে সাধু শুদ্ধাত্মা আছেন; কোথা কে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, এই খুঁজে খুঁজে তাঁদের আশ্রমে গিয়া দেখা করেন। কেও ঠাকুরকে ঠাকুরের মত আদর দেন না। ক্ষুধা পেয়েছে, কারও কাছে কিছু খেতে চাচ্ছেন—সে দিবে না—ঠাকুর নাছোড়বান্দা। রামকৃষ্ণজীর অতি কোমল অঙ্গ, সত্য সত্যই যেমন নবনীতে গড়া। মাটীতে পা ফেলে চলে গেলে, পদে পদে পা কেটে রক্তাক্ত হবার আশঙ্কা। একবার ফুলকা লুচির

ধারে আঙুল কেটে গিছ্‌লো—এই ধ’রে বুঝ’ কি কোমল শরীর। দশ বিঘা চলে যেতে হ’লে গাড়ির দরকার; এই গাড়ি ভাড়ার জন্য লোকের মুখাপেক্ষী হ’তে হোতো।

এইখানে একটা কথা প্রণিধান কর। যে ঠাকুর ত্যাগীর শিরোমণি—যাঁর ত্যাগ কায়বাক্যমনে একতানে বাঁধা, কামিনী-কাঞ্চন-স্পর্শে যাঁর অঙ্গ-বিকার হ’তো, যিনি পার্থিব কোন বস্তুর প্রার্থী নন, সুতরাং যার কোন বস্তুরই অভাব ছিল না, যাঁর মা-কালীগত প্রাণ, যাঁর সর্ব্বদা মা-কালীর সঙ্গে কথা হ’তো; যিনি মনে কর্‌লেই তৎক্ষণাৎ তাঁয় তন্ময় হ’তেন, তাঁর লোকের দুয়ারে দুয়ারে দীন ভিখারীর মত সশঙ্কিতে যাবার প্রয়োজন কি? এর কারণ যদি জান্‌তে চাও, তাহ’লে আকাশ পানে ঐ মেঘগুলিকে চেয়ে দেখ’। এই বর্ষা কাল, মেঘগুলিকে ডাক্‌তে হয় না, আপনি ব্যাকুল হ’য়ে চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে; কেন জান’—জল দিয়ে উত্তপ্ত ধরণীকে তাপ থেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য—শুদ্ধ ধরণীকে শীতল করা নয়, আবার তাকে শস্যশালিনী কর্‌বার জন্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণ-জীরও এই মেঘের দশা—অপার করুণাসিন্ধু দয়াবতার—মেঘ যেমন জলভারে চঞ্চল, ঠাকুরও তেমনি করুণার ভরে চঞ্চল। ব্যাকুল প্রাণে দিগ্‌দিগ জ্ঞানশূন্য হ’য়ে দুয়ারে দুয়ারে এখানে সেখানে ঘুর্‌ছেন—একমাত্র উদ্দেশ্য ঈশ্বরতত্ত্বরূপ শীতল শান্তিদানে ত্রিতাপ সন্তাপ থেকে জীবকুলকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে। তাঁর দয়ার ইয়ত্তা নাই; দয়ার তিলের তিল অনুভব কর্‌বার মানুষের শক্তি নাই। ঠাকুরের দয়ার কথা শুন’—তাঁর দেহখানি যেমন দয়ার্দ্র, তেমনি কষ্ট-সহিষ্ণু। দয়া ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার বিষয় যদি দেখ্‌তে চাও, তা হ’লে এই সর্ব্বসহা মাটী পানে তাকিয়ে দেখ’—কঠোর লোহার

কোদালে, লাঙ্গলে নানা উপায়ে খুঁড়্ছে, কাট্‌ছে,—সে যেমন একবারও কষ্ট হয় না, কিছু বলে না—বরং তার বদলে নানা দ্রব্য দিয়ে লোকের পরমোপকার করে; ঠাকুরও তদ্রূপ, কত লোকে কত কটুকাটব্য বল্‌ছে, কত লোকে কত রকমে শ্রীঅঙ্গের উপর অত্যাচার করেছে, কত শত অসদ্ব্যবহার করেছে, তিনি কিন্তু তাদের মঙ্গল-বিধানে ও সাধনে সর্ব্বদাই তৎপর ও ব্যাকুল। তাঁর শ্রীদেহটি কেমন, তার কথাতো তোমাকে ব'লেছি, তার উপরে অতি সামান্য অনিয়ম কি অত্যাচার হ'লেই তিনি সহজেই অসুস্থ হোতেন। একবার ভারি পেটের পীড়া—অন্ন ত্যাগ কর্‌তে হ'লো, দিনের মধ্যে একবার মাত্র অতি অল্প জলসাগু; এমন অবস্থাতেও তাঁর এখানে ওখানে যাবার বিরাম নাই। তাঁর কাছে একটি মহা-তাপসী থাক্‌তেন; তিনি হাজরা নামে পরিচিত। হাজরা একদিন ঠাকুরকে বুঝালেন—তুমি সিদ্ধ পুরুষ, মুক্ত পুরুষ, সমাধিপর;—তাঁয় তন্ময় হ'য়ে থাক' না কেন? পীড়িত শরীর—এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার দরকার কি? ঠাকুর বালকের মত, যে যা বলে, তাই তখনি বিশ্বাস করেন; হাজরার কথা শুনে, মনে কর্‌লেন, তাই-ত বটে, আমার ছুটাছুটি কর্‌বার আবশ্যক কি! এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে পঞ্চবটীতে গিয়া হাজির। সেখানে গিয়াই একবারে কেঁদে অস্থির এবং দ্রুত-পদে তখনি ফিরে এসে হাজরাকে বল্লেন—ওরে শালা, আমি তোমার কথা শুনবো নাই, জল-সাগু খেয়েও দুয়ারে দুয়ারে গিয়া পরের উপকার কর্‌বো। এখন বুঝ' দেখি, ঠাকুরের দয়ার অসার পসার কতখানি। এ দয়ার ভাব কি মানুষের মাথায় আসে? মানুষমাত্রেই ঘোর স্বার্থপর, বিনা স্বার্থে অতি

সামান্য কাজও করে না; সুতরাং স্বার্থপর হৃদয়ে দয়া থাকা দূরে যাক্, দয়ার মহিমা কি তার আভাস পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না।

এই কাল গুরু-হারা কাল; এ কালে ভগবানের বিষয় চিন্তা করা দূরে যাক্, তিনি যে আছেন, এ বিশ্বাসই মানুষের ঘটে নাই। কোটির মধ্যে দু এক জনের, যাঁদের এ বিশ্বাস আছে, তিনি পাকা বুঝে রেখেছেন যে, জীবের ভগবান্-লাভের কোন উপায় নাই; তবে পুরাণাদিতে, কি প্রাচীন সাধু-ভক্তের মধ্যে যে ভগবান্-লাভের কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়, সে কোন্ কালের কথা। কখন্ কার কি হ'য়ে গেছে, সে ধর্ত্তব্য নয়। এখন আর সে দিন নাই। এবংবিধ কোটি কোটি মানুষের মধ্যে দু এক জন যাঁরা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁরা জোর কর্ম্মকাণ্ডে পর্য্যন্ত পোঁছে গেছেন। এই ত কালের গতিক এমন সময় ঠাকুরের অবতারণা। অবতীর্ণ আবার কেমন ভাবে? একবারে বাহ্যৈশ্বর্য্যবিহীন—লোকে যে ধরবে, তার কোন কিছুই নাই। অতি সরল, অতি সোজা, অতি দীন-বেশ। যিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর আত্মা, ভক্তের ভগবান্, যিনি সৃষ্টি-প্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহাদেবীর স্বামী; যিনি জীব জগতের সৃজন, পালন ও নিধন কার্য্যের একমাত্র দেবতা;—সেই তিনি যে এই দীন-দ্বিজ-নিরক্ষর-বেশে কাঙ্গালের মত মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমান, এ ব্যাপার জীবের মাথায় ঢুকে কি ক'রে? ভগবান যখন লীলার বেশে অবতার হ'য়ে লীলাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁকে চেনা বড়ই মুস্কিল—বড়ই শক্ত।—এখন বুঝলে ত, ব্যক্ত হ'য়ে গুপ্ত আর সোজা হ'য়ে বাঁকা কাকে বলে?

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের যাবতীয় অবস্থা অপেক্ষা দেহ-ধারণে লীলাক্ষেত্রে অবতারণা-ব্যাপার অতি দুর্বোধ্য ও বিস্ময়কর। জ্ঞানী ও যোগীর চক্ষে ভগবান্ তেজোময়, ভক্তের চক্ষে রস-ময়। এই কারণে জ্ঞানী ও যোগীর রুচি অপেক্ষা ভক্তের রুচি সহস্রগুণে প্রশংসনীয় ও বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানী ও যোগীর রুচি এক-ঘেয়ে অর্থাৎ ভগবান্‌কে এক রকমেই সম্ভোগ করেন, ভক্তে কিন্তু নানা ভাবে ও রসে সম্ভোগ করেন। এই বিষয়টি ঠাকুর রামকৃষ্ণজী সানাই বাজনার উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন। যারা সানাই বাজায়, তাদের মধ্যে দুজনের হাতে সানাই থাকে; একজন খালি পোঁ ধ'রে সুরটী দিয়ে যায়, আর অপর ব্যক্তি বিবিধ রাগ-রাগিণী বাজায়। এখানেও তাই; জ্ঞানী ও যোগীর একভাবে আস্বাদ, ভক্তেরা ঝালে, ঝোলে, অম্বলে ও ভাজায় রসময়কে আস্বাদ করেন। এমন মনে ক'রো না যে, ভগবান্ কেবলমাত্র তাঁর সাকার রূপটিই ভক্তকে দেখান্, আর কিছু দেখান্ না—তা নয়—তিনি নিজেই যে জীব-জগৎ-রূপে পরিণত, তিনি নিজেই যে পঞ্চভূতাদি চতুর্ব্বিংশতত্ত্ব; তিনি নিজেই যে জীব-জগতে আত্মারূপে বিরাজিত—এগুলিও দেখান্, আবার তাঁর যে একটি নিরাকার ভাব আছে, তার জানিয়ে দেন। জ্ঞানী ও যোগীরা ভক্তের ভাবের সন্ধানও পান না। ভক্তে ভগবানের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হয়েন, তৎসম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণজী হনুমানের প্রতি রামচন্দ্রের একটী প্রশ্নের কথা উল্লেখ কোরে বুঝিয়েছেন; সেটি এই—রামচন্দ্র একদিন হনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে হনু! তুমি আমাকে কি রকম দেখো?" তায় হনু বল্লেন—"হে রাম, আমি তোমাকে

কখন দেখি, তুমি প্রভু, আমি দাস; কখন দেখি, তুমি বৃহদাগ্নি, আমি তার একটী ফিন্‌কি, আবার কখন দেখি, তোমায় আমায় ভিন্ন ভেদ নাই।" হনুকে রামচন্দ্র তার সকল ভাবই দেখালেন। হনু কিন্তু অন্যভাব দুটিতে লক্ষ্য না রেখে, সেব্য সেবক ভক্তিভাবেই রৈলেন। ভক্তিভাবের মধুর আস্বাদন একবার জান্‌লে কি পেলে, কেউ আর অপর কিসেও যেতে কি থাক্‌তে চান না। দেবর্ষি নারদেরও এই ভাব। জ্ঞানী ও যোগীর তুলনায় ভক্তদের কোটিগুণে কষ্ট আছে, কিন্তু এমনি ভক্তের জাতি, ভক্তির চাটের লোভে, জেনে শুনেও যাবতীয় কষ্টকে গায়ের অলঙ্কার ক'রে রাখে। উদ্ধব বৃন্দাবনে গোপীনীদিগকে যোগতত্ত্ব বল্লেন, কিন্তু কেউ সে কথা কানেও নিলে না। কৃষ্ণবিরহে গায়ের চামড়া পুড়ে গেল, সোনার কান্তি অঙ্গারবৎ হ'লো, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হ'লো, তবু কেউ একবার চোখ্ মুদ্‌লে না। মিছরির রস খেলে যেমন ঝোলা গুড়ে মোটেই মন হয় না, তেমনি চোখ চেয়ে যে একবার ভগবান্‌কে সম্ভোগ ক'রেছে, সে ম'রে গেলেও আর চোখ্ মুদে দেখ্‌তে চায় না। তাই বলিহারি ব্রজের ভাব—যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ তার কাছে কিসেও লাগে না।

হায়রে তপস্বী মহাঋষি মুনিগণ।
ত্রিভুবন সর্ব্বজন-আরাধ্য চরণ॥
আজীবন অনশন তরুতলে বাস।
অবিরত নানা ব্রত কঠোর সন্ন্যাস॥
প্রয়াস কেবলমাত্র তুচ্ছ ধন হেতু।
ত্রিতাপ সন্তাপ ভয়ে হ'য়ে অতি ভীতু॥

যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ সুখ দুঃখ পার।
দেখিতে হ'লো না সাধ ব্রজের ব্যাপার॥
যোগানন্দ ব্রহ্মানন্দ কি আনন্দ ধরে।
যে আনন্দ গোপিনীর এক বিন্দু নীরে॥
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি।)

দেহধারী ভগবান্‌কে চেনা বড় শক্ত। তিনি যে ভাবে বা যে রূপেই আসুন না কেন, তিনি চিন্‌বার শক্তি না দিলে কেউ চিন্‌তে পারেন না। এক চৈতন্য দ্বারায় তাঁকে ধরা যায়। আমি দিবালোকে বস্তু-দর্শনের ন্যায় স্পষ্ট দেখ্‌ছি- ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর শ্রীদেহখানি কেবলমাত্র চৈতন্যের জমাট বাঁধা। জল যেমন খুব ঠাণ্ডা পেয়ে জমাটি বেঁধে বরফের আকারে পরিণত হয়, তেমনি ঠিক চৈতন্য ভক্তির হিল্লোল-যোগে প্রভুদেবের শ্রীদেহখানি হ'য়েছে। এই দেহধারী চৈতন্য-ময়কে ধর্‌বার জন্য তাঁর প্রদত্ত চৈতন্যই একমাত্র উপায়। চৈতন্যের সহায়েই চৈতন্যময় গোচর হন। ভক্তিতে ও চৈতন্যে আমি বড় তফাৎ দেখ্‌ছি না; যে ভক্তি সেই চৈতন্য, যে চৈতন্য, সেই ভক্তি। মানুষের মন-বুদ্ধি যত দিন মলিনা-বস্থায় থাকে, তত দিন তারা স্বতন্ত্র প্রকৃতিযুক্ত থাকে, কাজেই মন-বুদ্ধি এই উভয় নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তারা নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হবা মাত্র, সেই দুটি জিনিসে মিলে একটী হয়। এই মিলন অবস্থায় তাদের পূর্ব্ব-প্রকৃতি বা নাম কিছুই থাকে না, তখন তাদের নাম চৈতন্য। যে, যে প্রকৃতির বা জাতির বস্তু, সে সেই প্রকৃতি বা জাতির বস্তু চিন্‌তে পারে ও তাকে ধর্‌তে পারে; সুতরাং চৈতন্যবান্

চৈতন্যসহায়ে চৈতন্যময়কে ধরে, আর অচৈতন্যবানেরা অবিদ্যার বাজারের বস্তু চিনে ও তাদিগে ধরে। জীবের হৃদয়ে চৈতন্য দিয়ে আপন স্বেচ্ছায় চৈতন্যময় ধরা দেন। প্রভুদেবের প্রেমিক ভক্ত দেবেন্দ্র বাবু একবার তাঁর স্বরূপ দে'খে আনন্দোৎফুল্লে অস্থির হন; ঠাকুর তৎক্ষণাৎ সেটি জান্‌তে পেরে, তাঁর দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে একটি গীত গাহিতে থাকেন। গীত এই-

ওরে কুশি লব, কি কর গৌরব, ধরা না দিলে কি পার ধর্ত্তে।

দেহধারী লীলাক্ষেত্রে যতই সামান্য বেশে থাকুন না কেন, চৈতন্যবানে ঠিক তাঁর স্ব-স্বরূপ দেখ্‌তে পান। চৈতন্যের সহায়ে রামকৃষ্ণভক্তেরা তাঁদের সেই দীনবেশধারী ঠাকুরকে দীননাথরূপে দেখ্‌ছেন; তাঁর নিরক্ষরবেশে তাঁকে সর্ব্বজ্ঞরূপে দেখ্‌ছেন; তাঁর নিরৈশ্বর্য্যের মধ্যে তাঁকে ষড়ৈশ্বর্য্যবান্ দেখ্‌ছেন ও সসীম আকারের মধ্যেই তাঁকে অসীম দেখ্‌ছেন। রামকৃষ্ণজীর পাদপদ্মে সরল বিশ্বাস রেখে চ'লে চল, সত্বর পূর্ণ-মনোরথ হবে। অবতাররূপী ঈশ্বরের রূপান্তর দে'খে, কি তাঁর কোন অমানুষী-শক্তির পরিচয় নিয়ে, তাঁয় বিশ্বাস কর্‌বার কল্পনা আর তাঁয় ঘোর অবিশ্বাস করা, একই কথা। কথাটা খুলে বলি শুন'—তুমি বল্‌বে, যদি রামকৃষ্ণজী তাঁর ঐরূপে আমাকে কালী, কি কৃষ্ণ, কি রামরূপ দেখান্, তা হ'লে আমি তাঁকে ভগবান্ ব'লে মান্‌তে পারি—এরূপ ধারণা-স্থলে বুঝে নিও, এ আর কিছুই নয়, কেবল ঘোর অবিশ্বাস মাত্র। যার একরূপে বিশ্বাস না হয়, তার কোনরূপেই বিশ্বাস হবে না। মানুষের বুদ্ধির তারিপ দেখ',—অকূল সাগর-পারে যেতে একখানি কাঠের তক্তার উপর বিশ্বাস

করছে; এই ভয়ঙ্কর সংসারে মুর্ত্তিমতী অবিদ্যার হাতে মন-প্রাণ দিতে বিশ্বাস করছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে বিশ্বাসের সময় মানুষের যত আশঙ্কা, যত সন্দেহ, যত তর্ক ও যত বিচার। মানুষ যত বাহাদুর, মানুষের যতটা দৌড়, তা আমি বিশেষ জেনে শুনে একটা আক্কেল পেয়েছি, এবং সেই আক্কেলমত বলছি—ভাই চিবিয়ে খেও না—গিলে খাও। চিবিয়ে খাওয়া কাকে বলে জান'—তর্ক-যুক্তি বিচার-সহায়ে বিশ্বাস কর্‌বার চেষ্টার নাম চিবিয়ে খাওয়া। তুমি যাদের উপর ভরসা রেখে যেতে মনে করছো, তাদের ততদূর যাবার গায়ে বল নাই। ভগবান্ তর্ক, যুক্তি ও বিচারের পার; তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, মনাতীত। তোমার একমাত্র পুঁজি তোমার মন-খানা—সে মনের কি সাধ্য যে, তাঁর কাছে যাবে; তাঁর কাছে যেতে হ'লে মনখানা পথে প'ড়ে থাকে—এমত স্থলে বিচার, তর্ক, যুক্তি নিয়ে কি কাজ হবে? তার পক্ষে সহজ সরল উপায় গিলে খাওয়া অর্থাৎ "তুমি যা কর ঠাকুর" এই ব'লে সরল প্রাণে তাঁর শরণাপন্ন হওয়া। তাঁকে না পাও, তাঁর নামের আশ্রয় গ্রহণ কর।

মনবুদ্ধি যতদিন গায়ে ময়লা মেখে ভুত হ'য়ে ব'সে থাকে, ততদিন হাঁক্ ডাক্ জারিজুরি তর্জ্জন-গর্জ্জন কর্‌তে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; আর যখন ময়লাটা কেটে যায়, তখন তাদের অবস্থা ঠিক নিমকপেকো প্রভুপরায়ণ কুকুরের মত। মানুষকে ভুতে পাওয়ার কথা শুনেছ'ত? ভুতে পেলে ও ভুত ছাড়্‌লে যেমন অবস্থা, সমল অবস্থায় ও বিমল অবস্থায়, মনবুদ্ধির অবস্থাও তদ্রূপ।

মনখানাতে যে ভূতটী পেয়ে রয়েছে সেই ভূতকে ছাড়াতে হ'লে অর্থাৎ সমল মনকে বিমল করতে হ'লে, ভগবানের নামের শরণ লওয়া একটী সহজ উপায়। অবিরত সরল-প্রাণে ভগবানের নাম করতে করতে সমল মন বিমল হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণজী বার্ বার্ ব'লেছেন, নামের অপার মহিমা। নামই বীজ, নামই গাছ, নামই ফল। নামের ভিতরেই ভগবান্ নিজে আছেন। কথায় বল্‌লে মানুষ সহজে নেয় না, তাই রামকৃষ্ণজী জীবশিক্ষার জন্য নিজে প্রাতঃসন্ধ্যা করতালি দিয়ে তালে তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ভগবানের নাম নিতেন। নামে উন্মত্ত হ'য়ে যেতেন। তার পর নামোন্মত্ততা গভীর সমাধিতে পরিণত হ'তো। এতে ঠাকুর জীবকে দেখাচ্ছেন ও বলছেন, যে সমাধি জন্ম জন্ম বিবিধ কঠোর সাধনার ফল, সেই সমাধি নামের বলেও পাওয়া যায়। এ বিষয়টি অর্থাৎ নামের বলে সমাধিপর হওয়া কেমন, তা তিনি একটী বিশেষ উপমা দিয়ে বুঝাতেন—যথাঃ—এক সাধু বৈষ্ণব প্রথমে এই ব'লে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করলেন, "গোউর আমার মাতা হাতি।" ক্রমাগত "গোউর আমার মাতা হাতি" বল্‌তে বল্‌তে যখন ভাবোদ্দীপ্ত হ'লো, তখন "গোউর" কথাটি ছেড়ে দিয়ে, বল্‌তে থাকেন-"আমার মাতা হাতি" পরে যখন সেই ভাব অপেক্ষাকৃত ঊর্দ্ধে উঠ্‌লো, তখন "মাতা হাতি" বই আর বেরোয় না; পরে যখন ভাব আরও প্রবল হ'লো, তখন সাধুর মুখে কেবল "হাতি হাতি"; পরে অত্যুচ্চ অবস্থায় খালি "হ" ব'লেই বাহ্য-শূন্য ও নীরব অর্থাৎ সমাধিপর। নামের শরণাপন্ন হওয়া, নাম শ্রবন, নাম কীর্ত্তন করা, ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর মতে, একেই

নারদীয় ভক্তি বলে। কলিকালে ভগবান্-লাভে এই নারদীয় ভক্তিই প্রশস্ত। রামকৃষ্ণজীর ভাবটি কেমন,—ভিতরে গভীর পূর্ণ ষোলআনা জ্ঞান, কিন্তু কাল পাত্র দে'খে জীবশিক্ষার জন্য সর্ব্বদা ভক্তির চাদরখানি গায়ে দিয়ে থাক্‌তেন। হাতির যেমন দু রকমের দাঁত; যে দাঁতে খাদ্য-দ্রব্য চিবিয়ে খায়, সে দাঁত ভিতরে লুকান' থাকে, আর বাহিরে দেখাবার জন্য অন্য দাঁত, সেই রকম ঠাকুরের ভিতরে জ্ঞান আর উপরে লোক-শিক্ষার জন্য ভক্তিভাব। নামমাহাত্ম্যে ঠাকুর যে গীতগুলি গাইতেন বলি শুন'—

(১) নামের ভরসা কালী করি গো তোমার।
কাজ কি আমার কোশাকুশী দেঁতর হাসি লোকাচার॥
নামেতে কাল-ফাঁস কাটে, জেঁাটে তা দিয়েছে র'টে;
আমি ত সেই জঁটের মুটে, হয়েছি আর হব কার।
নামেতে যা হবার হবে, মিছে কেন মরি ভেবে,
একান্ত ক'রেছি শিবে, শিবের বচন সার॥

(২) আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, দেখা যাবে-গো শঙ্করী।
যদি নাশি গো-ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী,
আমি এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

ঠাকুর এই গান গাইতে গাইতে বিভোর হ'তেন; সেই বিভোর অবস্থা যিনি দেখেছেন, তিনিই বুঝেছেন যে, নামের মহিমা কি।

চৈতন্যলীলায় গিরিশ বাবুর বিরচিত নাম-মাহাত্ম্যের গীত তোমরাই ত গাও—

এমন মধুর হরির নাম হরি বল'না।
সাধের পণে কিনবি হরি সাধ কেন তোর হ'লো না।
পাপী তাপীর নাহিক রে বিচার; হরি বোল্লে যে একবার,
করুণার তুলনা নাহি তাঁর,
নামে হও মাতোয়ারা মিছা কাজে ভুল না।

ভাই—বিচার, তর্কে কিছু দরকার নাই; ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর প্রদর্শিত পথে খালি নাম সম্বল ক'রে চল'—দেখ্‌বে, সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছো। তোমাকে গীতাও পড়্‌তে হবে না, বেদান্ত, সাংখ্য দর্শনও দেখ্‌তে হবে না, পঞ্চতপাও করতে হবে না, তীর্থে তীর্থে চারি ধামেও ঘুরতে হবে না, ধ্যান-জপও করতে হবে না, সন্ন্যাসও নিতে হবে না, স্ত্রী-পুত্রও ছাড়্‌তে হবে না, ঘর-দুয়ার দেশ ত্যাগও করতে হবে না, কোন কঠোরতাই নিতে হবে না; দয়ার নিধি, ভবপারের কাণ্ডারী রামকৃষ্ণজীকে ধ'রে ব'সে থাক', অতি সত্বর কাজ গোছে যাবে। দয়াল রামকৃষ্ণজী নিজে বহুকাল কঠোর কঠোর সাধন-ভজনে সিদ্ধিলাভ ক'রে, তাঁর ভজনবিহীন, বল-বিহীন, সম্বলবিহীন, অনাশ্রয়, দীন, শরণাপন্নদিগের জন্য সমস্ত সাধনার্জিত ফলগুলি সঞ্চয় ক'রে রেখেছেন। পিতার বহু শ্রমার্জিত সম্পত্তি যেমন অকর্ম্মণ্য অলস ছেলেরও ভোগ্য, তেমনি রামকৃষ্ণজীর শরণাপন্নদের মধ্যে যিনি যতই নিকৃষ্ট হউন না কেন, তিনিও তাঁর সম্পত্তির অধিকারী। রামকৃষ্ণজীকে আপনার চেয়েও আপনার মনে ক'রে, দুনিয়ার মজা লুঠো, কোন

চিন্তা নাই; সময়ে দেখ্‌তে পাবে, ঠাকুর ঠিক থিয়া পারে নিয়ে গেছেন। সাবধান—মাঝিকে ছেড়ো না—আর যা ইচ্ছা তাই কর'। পিপে পিপে মদ খাও, কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু অগ্রভাগ ঠাকুরকে দিয়ে খেও; যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও, কিন্তু মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে যেও। ঠাকুর রামকৃষ্ণজী এমন দয়াল, যে একবার তাঁর শরণাপন্ন হয়, সে যেখানে তাঁকে নিয়ে যায়—তা শ্মশানই হউক আর মশানই হউক, তিনি পরম পিরীতে সঙ্গে যান ও সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন—সাবধান—বার্ বার্ সাবধান—রামকৃষ্ণজীকে ছেড়ো না। যদি ব'ল আমি—মলিনাত্মা, মলিন-মন কর্ত্তৃক পরিচালিত, কাম-ক্রোধাদির অধীন এবং তজ্জনিত কত পাপকর্ম্ম ক'রেছি, আমার আর উপায় কি আছে! তা হ'লে তুমি এখনও রামকৃষ্ণজীকে দেখ্‌তে পাও নাই; তাঁর দয়ার অসার পসারের কিছুই জান্‌তে পার নাই; রামকৃষ্ণলীলার আভাসও পাও নাই। ভগবানের ভাণ্ডারে দয়া নামে যে একটি অপূর্ব্ব জিনিষ আছে; সেই দয়াতে রামকৃষ্ণজীর শ্রীদেহখানি গঠিত। দয়াময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে কেবলমাত্র দয়া বই অন্য উপাদান নাই। সেই দয়ার বলে ও গুণে স্বয়ং সৃষ্টীশ্বর, রামকৃষ্ণরূপধারী—সে কেন জান'? তোমার আমার মতন ঘৃণ্য, অস্পর্শীয়, হীনবুদ্ধি জীবের উদ্ধারের জন্য। রামকৃষ্ণজীর রূপ, পতিত-পাবনরূপ, কাঙ্গাল-শরণ-রূপ, দীনবন্ধু-রূপ। যে রূপের এই গুণ ও এই মাধুরী, সেই রূপের কাছে, তুমি আবার মলিনাত্মা, মলিন-মন, রিপুর অধীন—এই ভেবে ভবসিন্ধু পারে নিজেকে উপায়বিহীন মনে কোরে হতাশ হচ্ছো! হায় রে

বুদ্ধি! দেখ'—পুলিস যেমন চোরকে, তার সাহায্যকারীদের সহিত মায় বামালে গ্রেপ্তার করে, দয়ানিধি রামকৃষ্ণজীও ষড়রিপুপরিবেষ্টিত ইন্দ্রিয়াধিরাজ মনকে তোমার যাবতীয় কুকর্ম অপকর্ম্মের সহিত পাকড়াও কোরে নিয়ে যাবেন। পুলিশের বিচারালয়ে যেমন অপরাধীর কারাবাস—শাস্তির বিধি, দয়াল রামকৃষ্ণজীর বিচারালয়ে ভবকারাবাস-মুক্তির বিধি—বেকসুর খালাস। পুলিস ন্যায়বান্, প্রভুদেব দয়াল। প্রভুদেবের মধ্যে দয়ার উত্তাল-তরঙ্গ এত প্রবল যে, সেখানে অগণ্য অত্যুচ্চ-শৃঙ্গবিশিষ্ট কোটি কোটি হিমাচল সদৃশ গুরু কলেবর ন্যায় উপনীত হবামাত্র, তাকে যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তার আর নাম-গন্ধ-মাত্র পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণনামের শরণাপন্ন হোলে তিনি তাঁকে অচিরে কাছে নিয়ে যেতে নিজের আইনে বদ্ধ আছেন। এজলাসে একবার দয়াময় মূর্ত্তি দর্শন করবামাত্র, সে খালাস, তার মন খালাস ও গত কর্ম্মফল মাত্রে সব সমূলে বিনষ্ট হয়। এখন নামের মহিমায় প্রভুর মহিমা বুঝ্‌লে ত? খুব সাবধান—দয়ানিধি রামকৃষ্ণ নামটি ছেড়ো না।

এখন সেই পূর্ব্বের কথা—বিচার-বুদ্ধি দ্বারা ভগবানের সাকারবাদের প্রতিবাদ করা, ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর মতে ঘোর অজ্ঞানের কাজ। সকল ভাবে, সকল মতে সাধনা দ্বারা ভগবান্‌কে নানাভাবে নানারূপে প্রত্যক্ষ ক'রে, ভগবান্ রামকৃষ্ণজী যাবতীয় বিবাদমান ধর্ম্মপন্থীদিগের মীমাংসার উদ্দেশে এই বল্‌ছেন—তোমরা যে, যা বোল্‌ছ সব সত্য; আপনার ভাবে, আপনার পথে সরল-প্রাণে চলে যাও, অবশ্যই ঈশ্বরকে এক সময়ে লাভ করবে। এই সুবিশাল, সার্ব্বভৌমিক,

উদার ভাব, একমাত্র রামকৃষ্ণজীর মধ্যেই বিকাশ। এখন তাঁর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তগণের মধ্যেও এই ভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে তাঁর কৃপা, সেখানে কোন ধর্ম্মের বা মতের প্রতি বিদ্বেষভাব স্থান পায় না। রামকৃষ্ণপন্থীরা ভগবানের যাবতীয় ভাব, রূপ অতি শ্রদ্ধার সহিত শিরোধার্য্য করেন। কোন পন্থীর সঙ্গে তাঁদের সম্পূর্ণ মেল না হোতে পারে, কিন্তু তাঁদের কোন ধর্ম্মের বা মতের প্রতি বিদ্বেষভাব মোটেই নাই; এটা জাজ্জ্বল্যমান দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এবং ইহাই রামকৃষ্ণভক্তের এক বিশেষ লক্ষণ। সন্তান-সন্ততিরা যেমন মা-বাপের স্বভাব স্বভাবতঃই আপনা হোতেই পেয়ে থাকে, রামকৃষ্ণ-ভক্তেরাও তদ্রূপ এই উদার ভাবটী তাঁদের ঠাকুরের নিকট পেয়েছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণজীর ভাবের কথা বারম্বার ব'লেছি; তাঁর মধ্যে এই জগৎগ্রাহ্য, জগৎ-প্রশংসিত,সার্ব্বভৌমিক বিশালভাবের বিকাশ থাকা হেতু,তিনিই একমাত্র জগদ্‌গুরু নামের বাচ্য, এবং যাবতীয় পথে বা মতে তিনিই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উহাই তার পরিচায়ক। লোক-প্রকাশক সূর্য্য-কিরণে প্রকাশমান যাবতীয় বর্ণের ন্যায়, যাবতীয় নিগূঢ় ঐশীতত্ত্বপ্রকাশক রামকৃষ্ণলীলায় সকল ধর্ম্মের, মতের বা পথের সরল অনন্ত মূর্ত্তিমান্ লক্ষণ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অমানুষী সর্ব্বসম্মত ধর্ম্মতত্ত্বের স্ফূরণ, এক ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোথাও প্রকাশের স্থান নহে। যাবতীয় মতে কঠোর কঠোর সাধনা দ্বারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতঃ ধর্ম্মমাত্রেই যে, সব সত্য এটি প্রতিপাদন করা, এক ভগবান্ ভিন্ন আর কাহারও শক্তিতে নাই। কামিনী-কাঞ্চন-গত-প্রাণ, মায়ামুগ্ধ, ঘোর-তমসাচ্ছন্ন, একান্ত ইন্দ্রিয়সেবী ও জড়ভাবাপন্ন জীবকে

চৈতন্যের মুরলী-বাদন দ্বারা জাগরিত করা,এক ভগবান্ ভিন্ন অন্য কাহারও আয়ত্তে নাই। অনধীত-শাস্ত্র নিরক্ষরবেশে যাবতীয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল কথায়, সরল উপমাসহকারে ব্যাখ্যা করতঃ জগতের যাবতীয় শাস্ত্রাধ্যায়ী সুধীমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও নীরব করা এক ভগবান্ ভিন্ন এ শক্তির বিকাশ অন্যত্রে সম্ভবপর কখনই হোতে পারে না। যে আধারে ভগবৎ-শক্তির বিকাশ, সে, যে আধারই,হউক না কেন, সেই আধারধারীকেই ভগবান্ বল্‌তে হবে। যেখানে কৃষ্ণের ভাবের স্ফূর্ত্তি, সেই আধার দর্শনে কৃষ্ণ-দর্শন ভক্তমাত্রেই বিশ্বাস করেন। কেহ কেহ যোগপথাবলম্বী বলেন, মানুষমাত্রেই সাধনা দ্বারা কৃষ্ণ হ'তে পারে; কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেন না, ঠাকুর রামকৃষ্ণজী এ কথায় সায় দেন না। ভগবানের কৃপায় মানুষ কত দূর উচ্চপদ পান, তার সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, যথা—একজন ভক্ত ভগবানের সেবা করে। একদিন ভগবান্ নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন,—ভক্ত পদসেবা কর্‌ছেন—এমন সময়ে তার ঘুম এসে গেছে; ভগবান্ ভক্তকে বল্লেন—"তোর ঘুম পেয়েছে, তা আচ্ছা, আমার এই বিছানার একপাশে শুয়ে ঘুমো।" ভক্ত প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর বিছানায় ঘুমুতে লাগ্‌লো। এতে বেশ বুঝা যাচ্ছে, জীব কখনই ভগবান্ হ'তে পারে না। অজ্ঞানের জোরে কেহ মানুন্ বা নাই মানুন্—বা কেহ বলুন বা নাই বলুন; কিন্তু যে আধারে ভগবৎ-শক্তির বিকাশ, সেই আধারধারীকেই ভগবান্ ব'লে মান্‌তে হবে। তা না হ'লে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা সব মিথ্যা হয়। পুরাণাদি গ্রন্থ, ভগ-বানের যে সকল লক্ষণ আরোপ করেন, রামকৃষ্ণজীতে সে

সমস্তই রয়েছে। মহামায়ার এমনই খেলা, তিনি দেহধারী ভগবান্‌কে জানিয়ে দিয়াও জান্‌তে দেন নাই। এ কথাটি কেমন, তা আমি তোমাকে একবার বলেছি আবার খুলে বলি শুন'—প্রভুদেবের সাধন-ভজন-লীলায় একটী স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে জুট্‌লেন; তিনি যেমন বিদ্যাবতী, তেমনি ভক্তিমতী। শাস্ত্রীয় বিচারে কোন পণ্ডিত তাঁকে পরাজয় কর্‌তে পারেন নাই। তিনি প্রভুর লীলায় ব্রাহ্মণী নামে বিদিত। মথুরবাবু সে সময়ের যাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ দ্বারা আহ্বান ক'রে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শাস্ত্রিক বিচার করান, কিন্তু ব্রাহ্মণীকে কেহ পরাস্ত কর্‌তে পারেন না। ব্রাহ্মণী নিজের বিদ্যা ও ভক্তির সহায়ে রামকৃষ্ণজীকে ভগবান্ ব'লে ঠাওরালেন, আর সেই শুভ তত্ত্ব পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে জ্ঞাপন কর্‌লেন। পণ্ডিতেরা বিশ্বাস না করায়, দেহধারী ঈশ্বরাবতারের যে সব লক্ষণ পুরাণ গ্রন্থাদিতে লেখা আছে, সেই সব লক্ষণগুলিই রামকৃষ্ণজীর মধ্যে রয়েছে, এ ব্যাপারটী পণ্ডিতদিগে ব্রাহ্মণী স্পষ্ট দেখিয়ে দিলেন। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লক্ষণগুলি চাক্ষুষ দেখ্‌লেন ও স্বীকার কর্‌লেন; কিন্তু লক্ষণধারী রামকৃষ্ণজীকে আর ভগবান্ বল্‌তে পার্‌লেন না। এই দে'খে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, শাস্ত্রপাঠে বা শাস্ত্রে, ভগবান্‌কে জানিয়ে দিয়াও, জানিয়ে দিতে পারে না। সামান্য সরল যুক্তি ধ'রে গেলেও চিন্‌তে পারি বা নাই পারি, অন্ততঃ স্বীকারও কর্‌তে হবে যে, যেখানে লক্ষণ আছে সেখানে বস্তুও নিশ্চয় আছে; কেননা ছায়ার ন্যায় লক্ষণই বস্তুর পরিচায়ক। যেখানে বস্তু আছে, সেখানে লক্ষণ, প্রকাশক স্বরূপ বিদ্যমান থাকে, আর যেখানে লক্ষণ, সেখানে সে যে বস্তুর

লক্ষণ সেই বস্তুর সত্বা অবশ্যম্ভাবী। মনে কর, তুমি উদ্ভিদ্‌শাস্ত্র অধ্যয়নে জান্‌তে পার্‌লে, বটনামে একটী গাছ আছে। সে গাছের একটা বিশেষ গুণ, যে, তার ছায়া শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মকালে শীতল। পুস্তক পাঠে গাছের গুণ মাত্র তুমি জান্‌লে, কিন্তু গাছটি কেমন চক্ষে কখন দেখা নাই। সুতরাং গাছটী হঠাৎ দেখ্‌লে চিন্‌বারও কোন শক্তি নাই। একবার বিদেশ ভ্রমণে, দারুণ গ্রীষ্মকালে পথশ্রান্ত, পিপাশায় শুষ্ককণ্ঠ, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর এমন অবস্থায় ঘটনাক্রম এক বৃক্ষতলে উপস্থিত। বৃক্ষতল বড়ই শীতল, কিঞ্চিৎ কালমধ্যেই পরম তৃপ্তি বোধ হ'লো। প্রাণের আরাম-প্রদ বৃক্ষটীকে বার্ বার্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুস্তকে যে বটের কথা পড়াছিল সেটী মনে পড়ে গেল। গাছটী বট কি না, বিশেষরূপে জান্‌বার জন্য শীতকাল পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থিতি ক'রে দেখ্‌লে, শীতে বৃক্ষ-তল খুব গরম। এখন তুমি চিন্‌তে পার বা নাই পার, ঐ গাছটীকে বটগাছ বল্‌বে কি না? বল' দেখি?

একটী গীত শুন'।

আমি সাধে কি রামকৃষ্ণ পুজি।
সে যে আমার, অকুল পাথার ভব নদীর করুণ মাঝি।
সে যে আমার পরম সখা, নিজে খুঁজে দিলেন দেখা,
শত দোষে হয় না বাঁকা, যা বলি হন তাতেই রাজি।
সদাই পাছু পাছু ফিরে, পাছে কিছু পড়ি ফেরে,
ভেবে মরি বুঝ্‌তে নারি, সে ভজে কি আমি ভজি।
সে যে আমার অতি আপন, প্রাণের মতন করেন যতন,
কে আর এমন সুহৃদ্ সুজন, যেমন আমার রামকৃষ্ণজী॥

ইতি প্রথম ভাগ।